অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত

আশ্চর্য দুনিয়া

অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত

আশ্চর্য দুনিয়া

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন, ১৩৮৯
প্রকাশক ঃ মনীষী বসু, গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩
মুদ্রকঃ অ. বর্ধন, দীপ্তি প্রিণ্টার্স, ৪ রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলিকাতা ১৪
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ অদ্রীশ বর্ধন ॥ ছবি ঃ সঞ্জিৎ বর্ধন ॥ লেখা ঃ ধ্রুব রায়।
অলংকরণ ঃ ধ্রুব রায়

দাম ঃ ষোল টাকা

Scaned By
Daenerys
Stromborn
HOUSE OF TARGARYEN
MOTHER OF
DRAGONS

আশ্চর্য দুনিয়া-য় যাঁরা আছেন ঃ

এবং

সত্যজিৎ রায় বলছেন সায়েন্স ফিকশন ফিল্মের দু-চার কথা

সায়ান্স-ফিকশ্যন এবং স্পাইএর গল্প নাকি আজকাল ক্রমশই রহস্য-রোমাঞ্চের হাল্‌কা গল্পের জায়গা দখল করে বসছে। আমি জানি না স্পাই গল্পের বাজার কেন এত গরম—জেমস বণ্ড বোধহয় এর কারণ—তবে যে-যুগে দ্রুত বিজ্ঞান-কারিগরীর উন্নতি হচ্ছে, অতি সাধারণ মানুষেরও চোখের সামনে অতি নিকট থেকে তোলা চাঁদের ফোটো নতুন কল্পনার জগৎ মেলে দিচ্ছে, মহাকাশচারীকে মহাশূন্যে ভারহীন অবস্থায় ভাসতে দেখা যাচ্ছে, সে যুগে সায়ান্স-ফিকশ্যনের অভ্যুদয় হবেই।

সায়ান্স-ফিকশ্যন নতুন কিছুই নয়। যে রূপে আজ এ জিনিস আমরা দেখছি, অন্তত এক শতাব্দী আগেই তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, জুল ভের্ণের 'ফাইভ উইক্‌স্ ইন এ বেলুন' উপন্যাসে তার সূচনা। ভের্ণ প্রথমদিকে এ নিয়ে চর্চা চালিয়ে গেছিলেন, এরপর এচ্‌ জি ওয়েল্‌স্ 'দি টাইম মেশিন' নিয়ে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁর বিখ্যাত ডজনখানেক গল্পকল্প অ্যাডভেঞ্চার

কাহিনী পরিবেশন করলেন।

বলতে পারা যায়, বর্তমান শতকের প্রথম দশ-বারো বছরের শেষ থেকেই এই নতুন সাহিত্যশাখা শেকড় গাড়তে শুরু করে, এবং তখন থেকেই বিচ্ছিন্ন-ভাবে এর সমৃদ্ধি বিকাশ চলতে থাকে। আজ এর যে ফুলে-ফলে বাড়বাড়ন্ত দেখছি, তা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগের বিস্ময়াবহ ব্যাপার, যার মধ্যে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার অবদান-ধারা সংমিশ্রিত হয়েছে।

সিনেমার মধ্যেও যে সায়ান্স-ফিকশ্যন বিজ্ঞানসুবাসিত সাহিত্য বিকাশ প্রতিফলিত হয়েছে সমানভাবে, তার স্বাক্ষর ফ্রান্সের জর্জ মেলিসের 'এ ট্রিপ টু দি মুন' ফিল্ম্ এবং নির্বাক ছায়াছবি-যুগের গোড়ার দিকে তোলা ঐ ধরনের অন্যান্য কল্পনারঙীন ফ্যানটাসি ফিল্মের মধ্যে আঁকা হয়ে গেছে।

মেলিস্ মূলতঃ তাঁর সাদাসিধে দর্শকমণ্ডলীকে কিছু 'বিশের ধরনের কায়দাকৌশল' দেখিয়ে আনন্দ দেওয়ার জন্যেই এ ধরনের ছবিতে হাত দিয়ে-ছিলেন। এই উদ্যম আশ্চর্যের নয়, কারণ চলচ্চিত্রে ছবির ভ্রমবিলাস জাগানোর সম্ভাবনা এ পথের অগ্রণীদের মধ্যে যাঁরা একটু উদ্ভাবনপ্রিয় এবং আমুদে, তাঁদের মনে নাড়া দেবেই। আর মনে রাখতে হবে, মেলিস ছিলেন ভের্ণের দেশের লোক।

তবে তখনকার দিনে যা হয়—মেলিসের বহর ছিল ছোট। বড় ফ্যান-টাসি কল্পনারাঙানো ফিল্মের সৃষ্টি প্রতীক্ষা করে ছিল ১৯২০ সাল পর্যন্ত, তারপর ফ্রিৎস ল্যাংএর উচ্চাশাপূর্ণ উদ্যোগে প্রস্তুত ফিল্ম 'মেট্রোপলিস' নিয়ে জরমানী বিজয় পদক্ষেপ করলো এদিকে। এটি ভবিষ্যৎমুখী এক ফ্যানটাসি, কলাকৌশল এবং কর্মনৈপুণ্যের সুবাদে হৃদয় জয় করে ফেললো: সে-সময় কারিগরীতে কেউ জরমনদের ছাড়িয়ে যেতে পারত না। মেশিন প্রভুত্ব করছে এমন এক জগতের মানুষদের অবস্থা নিয়েই ফিল্মটির বিষয়-বস্তু। বিজ্ঞানসুবাসিত গল্প-লেখকদের কাছে এ ধরনের বিষয়বস্তু খুবই প্রিয়; এচ্ জি ওয়েল্স নিজেই তো এরকম ভবিষ্যদ্বাণীমূলক গল্প লিখেছিলেন 'দি শেপ অভ থিংস টু কাম'। গল্পটির ফিল্ম করেছিলেন আলেকজাণ্ডার কোরডা এবং এটি ১৯৩০ সালের যুগে বৃটিশ স্টুডিও থেকে প্রস্তুত সবচেয়ে বিরাট ছবি।

'মেট্রোপলিস' এবং 'দি শেপ অভ থিংস টু কাম' দুখানি ছবিই দৃশ্য অবতারণার মধ্যে দিয়ে কল্পনাকে সচকিত করে তোলার অভিযান শুরু করে।

অবশ্য, এগুলোর মধ্যে সামাজিক কথাও বলবার ছিল। কিন্তু যেহেতু ছবি-গুলির দৃষ্টি প্রসারিত ছিল বহু শতাব্দীর প্রান্তর পেরিয়ে, তাই সেই সময়-কার দর্শকরা ছবির সামাজিক ব্যাপারগুলির সঙ্গে যেন খানিকটা আবেগপ্রবণ সংস্পর্শ অনুভব করতেন। তার মানে বলতে হয়, ভবিষ্যতের দিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল নিষ্প্রাণ নিরুদ্বিগ্ন।

আজকাল অবশ্য এরকম রেওয়াজ নেই—অন্ততঃ ফিলমে নেই। আজ নতুন নতুন কাহিনী সম্ভার নিয়ে নতুন ধাঁচের এতরকম ছবি উঠছে যে, বিশ বছর আগের মতো এখন আর সায়ান্স-ফিকশ্যন ফিল্ম বলতে একটি মাত্র শিরোনামার নীচে তার বহুমুখী প্রকাশকে এক চোটে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না।

যেমন, তার একটি ধরন—যেটিকে তালিকার নীচের দিকেই স্থান দিতে হয়—তাতে থাকে দৈত্যাদানবাকৃতি প্রাণী—সেগুলো প্রাগিতিহাস যুগের জানা বা অজানা আকৃতি নিয়ে সাগরের তলা থেকে বেরিয়ে আসে কিংবা পারমাণবিক বা ঐরকম কোনো বিস্ফোরণের ফলে কোনো মেরু প্রদেশের হিমশীতলতা থেকে হয়তো মুক্তি পেয়ে বেরোয়।

আর একটি ধরন, একটু উচুঁ দরের, তাতে সাধারণ নিরীহ পিঁপড়ে, মাছি বা মাকড়শার মতো প্রাণীর কাহিনী থাকে, যারা বিজ্ঞানের বা প্রকৃতির দুর্ঘটনার দুর্বিপাকে আকৃতি বদলে দানবরূপ পরিগ্রহ করেছে।

তৃতীয় ধরনের ছবিতে মানুষকে কোনো বৈরী গ্রহের অশুভ শক্তির সম্মুখীন করা হয়। এর আবার শ্রেণীবিভাগ করা যায়, কেন না আপনি দেখবেন কখনো মানুষ যাচ্ছে অন্য গ্রহে, কখনো দেখবেন অন্যগ্রহের বাসিন্দা নামছে পৃথিবীর মাটিতে। আপনি এখনও দেখতে পারেন যে, বহির্গ্রহের বাসিন্দারা দূরস্থিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাহায্যে মানুষকে প্রভাবিত করছে আর মানুষকে সেই বিভীষিকার রূপবর্ণহীন নিরাকার চাপের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

চতুর্থ এবং শেষ ধরনের ছবিতে দেখা যায় মানুষ তার নিজেরই বিজ্ঞান কারিগরীর বিভীষিকায় আতঙ্কিত হচ্ছে। অবশ্য এ হলো প্রসিদ্ধ ফ্রাংকেন-স্টাইন ধরনের ছবি, তবে এরই নানা ধাঁচের যেসব ছবি উঠেছে, তাও অনেক। ফ্রাংকেনস্টাইন জাতীয় গল্পের দানবের জায়গায় রোবট আসছে এবং বহু সায়ান্স-ফিকশ্যন ফিল্মে সুচতুর ভাবে ভয়ঙ্কর রূপে এর আবির্ভাব ঘটানো হচ্ছে। এরকম সবচেয়ে ভালো ফিল্ম বোধ হয় 'ফরবিড্ন

প্ল্যানেট'। তবে বিপদাশঙ্কা সৃষ্টির জন্মে মানুষের তৈরী জিনিসের মধ্যে রোবটই বোধ হয় একমাত্র নয়। এমনকি প্রকাণ্ড দৈত্যাকার অঙ্কবিশারদ কমপিউটার মেশিন (যেগুলোকে 'জায়ান্ট ব্রেন' বলা হয়) ছবিতে এমনভাবে দেখানো হচ্ছে যেন সেগুলোর নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি জেগে উঠছে এবং সেই যন্ত্র নিজের সৃষ্টিকর্তারই বিরুদ্ধে রুখে উঠছে।

১৯৪০ সাল নাগাদ যখন থেকে সায়ান্স-ফিকশ্যন যাবতীয় কলাকৌশল এবং জ্ঞান-দক্ষতার সংস্পর্শ লাভ করতে থাকলো, তখন থেকেই এই ধরনের ফিল্ম সৃষ্টি হচ্ছে। তবে এরকম ফিল্ম কখনই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। অবশ্য যখন এসব ফিল্ম খুব বড় পরিকল্পনায় বিরাট জমকালো ভাবে করা হয়, তখন জনপ্রিয় হয়—যেমন হয়েছে 'ওয়ার অভ দি ওয়ার্লডস', 'ফরবিড্ন প্ল্যানেট', এবং ডিসনীর 'টোয়েনটি থাউজ্যাণ্ড লীগ্স্ আণ্ডার দি সী'। এসবের পাশে পাশে মাঝারি ধরনের কল্পনাপুষ্ট ফিল্ম তোলা হয়েছে, তবে সেগুলোর বহর দেখেই বোঝা যায়, প্রযোজকরা ছবির ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

যাইহোক, মনে হয়, অবশেষে এখন এমন একটা সময় এসেছে যখন সায়ান্স-ফিকশ্যন ফিল্মকে 'থ্রিলার' রহস্যচিত্রের চেয়ে খুব বেশী ঝুঁকি বলে আর ভাবা হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, এই ফিল্ম শাখাটি এমন সব চিত্রপরিচালকদের আকর্ষণ করতে শুরু করেছে, যাঁরা হালকা ধরনের ছেলেমানুষী কাজে কখনোই নিজেদের জড়াতে পারেন না। ফ্রান্সে ত্রুফো এবং গডার্ড, আমেরিকায় জোসেফ লোসী এবং স্ট্যানলী কুবরিক তাঁদের প্রথম সায়ান্স-ফিকশ্যন ফিল্ম করছেন কিংবা ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন। কুবরিকের ফিল্ম '২০০১ : এ স্পেশ ওডিসী' একটি ষ্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে। গত জুলাই মাসে আমি একদিন এর কাজ দেখতে পেয়েছিলাম; আমার সঙ্গে ছিলেন কুবরিকের 'এ স্পেশ ওডিসী'র যুগ্ম লেখক, জ্যোতির্বিদ, কলিঙ্গ পুরস্কার বিজয়ী সায়ান্স-ফিকশ্যন লেখক আরথার ক্লার্ক।

ফিল্মটির মধ্যে যে পরিমাণ গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা মেশানো হয়েছে, তা পরম বিস্ময়কর। ক্লার্ক নিজে প্রতিটি ব্যাপার নিশ্চিতভাবে যাচাই করে দেখেছেন, যেন বৈজ্ঞানিক দিক থেকে নিখুঁত নয় এমন কোনো জিনিস ফিল্মটিতে স্থান না পায়।

হাজার হাজার স্কেচ, প্ল্যান আর ডায়াগ্রাম নক্সা আঁকা হয়েছে স্পেশস্যুটের, রকেটের, মুন-বাসের এবং স্যাটেলাইট স্টেশনের—যেখানে ফিল্মটি

তোলা হচ্ছে সেই এম জি এম স্টুডিওর ডজনখানেক অফিস ঘরের সেল্‌ফে এবং ড্রয়ারে সেগুলো বোঝাই হয়ে আছে, ছড়িয়ে রয়েছে মেঝেতেও। একটা মস্ত বড় ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে মডেলের জন্যে—স্পেশশিপ, ল্যানডিং স্টেশন এবং স্যাটেলাইটের মডেল। সমস্ত উদ্যোগটির সুসংবদ্ধ নিখুঁত প্রয়াসের ব্যাপারটি দেখলে তবে বিশ্বাস হবে! যেহেতু চাঁদে যাওয়ার অভিযান নিয়ে গল্পটি রচিত, তাই একটি রকেট এর মধ্যেকার সমস্ত মূল্যবান উপাদানের অন্যতম হয়ে উঠেছে। রকেটটির ডিজাইন যিনি করেছেন, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি সত্যিকারের রকেট ডিজাইনের ক্ষেত্রে একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ রূপে পরিচিত হয়ে পড়েছেন। তার মানে, ফিল্‌মে যে রকেটটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি তত্ত্বসূক্ষ্মতার দিক দিয়ে সত্যিকারের আকাশ পাড়ি দিতে পারে, যদিও কখনই স্টুডিও চত্বরের বাইরে একে বেরুতে দেওয়াই হবে না।

আমি যখন স্টুডিওর সেটে হাজির হলাম, দেখলাম রকেটের কনট্রোল প্যানেলের একটা 'শট' তোলা হচ্ছে। এর জন্যে, কনট্রোল বোর্ডের ষোলটি ১৬ মি-মি ক্যামেরা বসানো হয়েছে এবং একসঙ্গে রঙবেরঙের ষোলটি চলচ্চিত্রান্বিত চার্ট ঐ বোর্ডের ষোলটি ভিউ-প্যানেলে ফেলা হচ্ছে। ঐ প্যানেলগুলির ফোটোই তুলে যাচ্ছে একটি ৭০ মি-মি ক্যামেরা। ক্লার্ক বললেন, ঐ সব চার্টগুলোই কোনো বিজ্ঞানীর কাছে অর্থপূর্ণ। এই অতি সযত্ন প্রয়াস এবং বিরাট বহর থেকেই মনে হয় 'এ স্পেশ ওডিসী' যাঁরা তুলেছেন, তাঁদের দৃপ্ত ঘোষণার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে; তাঁরা দাবী করেছেন, এ যা বিরাট ফিল্‌ম হবে, তেমন আর নাকি হয়নি। আর বিরাট মানেই স্বভাবত দামী! স্টুডিওটি থেকে সেদিন সন্ধ্যায় আমি সত্যি সত্যি এই ধারণা নিয়েই ফিরেছি যে, সায়ান্স-ফিকশ্যন অবশেষে নিজের মর্যাদা লাভ করতে শুরু করেছে; এবং ভবিষ্যতের গর্ভে মানুষের যা কিছু সঞ্চিত আছে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই আরো ভালো, আরো গুরুত্বপূর্ণ সায়ান্স-ফিকশ্যন ফিল্‌মের সম্ভাবনা রাখা আছে।*

---

*অমৃত বাজার পত্রিকা ১৯৬৬ পূজা বার্ষিকী থেকে অনূদিত। অনুবাদক: ডক্টর অসীম বর্ধন। □

ট্রেনে প্রত্যেকদিনই ভিড় থাকে। বসবার জায়গা পাওয়া একটা দৈবাৎ সৌভাগ্যের ব্যাপার। কলেজ থেকে ফেরার সময় সুলেখাকে প্রায় রোজই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসতে হয়। যদিও সে মেয়েদের কামরায় ওঠে, তবু সেখানেও জায়গা থাকে না।

মঙ্গলবার দিন ছুটি হয়ে গেল একটু তাড়াতাড়ি। সুলেখার কয়েকজন বন্ধু সিনেমা দেখবে ঠিক করলো। কলেজের কাছেই সিনেমা হল। সেখানে চার্লি চ্যাপলিনের একটা ছবি এসেছে। সুলেখাও রাজি হয়ে গেল। চার্লি চ্যাপলিনের দুটি মাত্র ছবি সে দেখেছে এর আগে, সেই থেকে চার্লি তার দারুণ প্রিয়।

কিন্তু সিনেমা হলে গিয়ে টিকিট কেটে গেট দিয়ে ঢোকবার মুখে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। বন্ধুদের বললো, না রে, আমি আজ যাবো না, তোরা যা।

বন্ধুরা সবাই অবাক। পাঁচটি মেয়ে দশটি বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার? যাবি না কেন?

সুলেখা বললো, আমার শরীরটা আজ কী রকম লাগছে! আমি বরং বাড়ি চলে যাই।

এই মেয়ের দলের মধ্যে কৃষ্ণাই সুলেখার বেশী বন্ধু। ওদের বাড়িও কাছাকাছি।

কৃষ্ণা এবারে একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, শরীর খারাপ লাগছে? কী হয়েছে রে? পেট ব্যথা করছে?

সুলেখা ভুরু কুঁচকে বললো, না, সে রকম কিছু না, ঠিক বুঝতে পারছি

না, কী রকম যেন লাগছে! তোরা চলে যা, তোদের দেরি হয়ে যাবে।

অন্য মেয়েরা বলতে লাগলো, চল, চল, একটু বাদেই ঠিক হয়ে যাবে। চার্লি চ্যাপলিন এমন হাসাবে যে তাতেই সব অসুখ সেরে যায়।

কৃষ্ণা বললো, না, রে, টিকিট কাটার পরেও ও যখন যেতে চাইছে না, তখন নিশ্চয়ই সীরিয়াস কিছু ব্যাপার। এই সুলেখা, তুই একলা ফিরতে পারবি, না আমিও তোর সঙ্গে যাবো?

সুলেখা বললো, না, না, তার দরকার নেই। আমি ঠিক চলে যাবো।

টিকিট ফেরৎ দিয়ে সুলেখা একটা সাইকেল রিক্সা নিয়ে চলে এলো স্টেশনে। ঘড়ি দেখলো পৌনে তিনটে বাজে। আর দশ মিনিটের মধ্যেই কৃষ্ণনগর লোকাল এসে যাবে।

সুলেখার ঠিক যে শরীর খারাপ লাগছে, তা নয়। আবার বন্ধুদের সে মিথ্যে কথাও বলে নি। শরীরটা কী রকম লাগছে। কী রকম যেন একটা অস্বস্তি। গত তিন দিন ধরে মাঝে মাঝেই এরকম হচ্ছে তার। শরীরটা হঠাৎ ঝিম ঝিম করে উঠছে। তখন মনে হয়, কোথাও কে যেন খুব করে ডাকছে তাকে। তার এক্ষুনি যাওয়া দরকার।

ঠিক সময়েই ঝমঝম করে স্টেশনে এসে ঢুকলো কৃষ্ণনগর লোকাল। এখন ট্রেন মোটামুটি ফাঁকা। মেয়েদের কামরায় মাত্র সাত আটজন রয়েছে। একটা আরামের নিশ্বাস ফেললো সুলেখা। বাবাঃ, কতদিন পরে যেন আজ সে বসে বসে যেতে পারবে।

কামরায় উঠে জানলার ধারে একটা জায়গা পেয়ে সুলেখা মাথা হেলিয়ে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সুলেখার বাড়ি মাত্র চারটে স্টেশান পরে। এই ট্রেনে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগার কথা। সুলেখার জ্ঞান ফিরলো দেড় ঘণ্টা পরে।

ট্রেন তখন একটা অচেনা স্টেশানে থেমেছে। সুলেখা নেমে পড়লো টপ করে।

সে যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কিংবা বাড়ি ছাড়িয়ে এতটা দূরে চলে এসেছে, সে জন্য একটুও দুশ্চিন্তার ছাপ নেই তার মুখে। বরং মুখখানা বেশ খুশী খুশী দেখাচ্ছে।

এমন হন হন করে বেরিয়ে গেল সুলেখা যে গেটের টিকিট চেকার তার কাছে টিকিটও চাইলো না। এই জায়গাটায় সুলেখা আগে কখনো আসে নি। অচেনা জায়গায় এলেই মানুষের মুখ-চোখ একটু অন্যরকম হয়ে যায়।

কিন্তু সুলেখা বেশ সচ্ছন্দ ভাবে নেমে এলো স্টেশানের সিঁড়ি দিয়ে। বাইরে কয়েকটা সাইকেল রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কাছে গেল না সুলেখা। স্টেশানের সামনে তিন দিকে তিনটে রাস্তা। বিনা দ্বিধায় ডান দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো সুলেখা।

নীল রঙের শাড়ী পরে আছে সুলেখা, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে তার বই খাতা, তার চুল বেণী করে বাঁধা। তরতর করে সে হাঁটতে লাগলো, যেন এই রাস্তা তার অনেক দিনের চেনা। এখানেই তার বাড়ি।

খানিকটা বাদেই শহর ফুরিয়ে গেল, রাস্তার দু'ধার প্রায় ফাঁকা। এক জায়গায় একটা ছোট ব্রীজ, তার তলা দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে যাচ্ছে।

এবারে মূল রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে নদীর ধারের সরু পথ ধরে হাঁটতে লাগলো সুলেখা। মিনিট পাঁচেক হাঁটবার পর রাস্তাটা এক জায়গায় শেষ হয়ে গেল। সেখানে একটা ইঁটখোলা। সেই ইঁটখোলাটায় অনেকদিন কাজ বন্ধ, লোকজন নেই, এখানে ওখানে আগাছা জন্মে আছে।

একটা ছোট ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে সুলেখাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, ও দিদি, এ দিকে কোথায় যাচ্ছেন ?

সুলেখা থমকে দাঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে তাকালো ছেলেটির দিকে। তার চোখ দুটো যেন জ্বল জ্বল করছে। সে তাকিয়েই রইলো, কোনো কথা বললো না।

ছেলেটি আবার জিজ্ঞেস করলো, দিদি, এদিকে কোথায় যাবেন ? কার বাড়ি খুঁজছেন ?

সুলেখা বললো, চুপ!

তারপর সে আবার হাঁটতে লাগলো ইঁটখোলার মধ্য দিয়ে।

ছেলেটি চেঁচিয়ে বললো, ও দিদি, ও দিকে যাবেন না। সাপ আছে। ওদিকে আর কোনো বাড়ি নেই।

সুলেখা গ্রাহ্যই করলো না।

ইঁটখোলাটা পার হবার পর খানিকটা জংলা জায়গা। দেখলেই মনে হয়, এখানে মানুষজন আসে না। তারই মধ্য দিয়ে খুব দ্রুত হাঁটছে সুলেখা।

এই অবস্থায় সুলেখাকে দেখলে তার চেনা কোনো লোক নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারতো না। সুলেখা খুব শান্ত আর লাজুক ধরনের মেয়ে। কলেজ ছাড়া সে আর একলা একলা কোথাও যায় না

কখনো। এই রকম একটা জায়গায় সে অ্যাডভেঞ্চার করতে আসবে, এটা যেন ভাবাই যায় না।

জংলা জায়গাটার পরে একটা বিশাল জলাভূমি। অনেকটা দহের মতন। কুচকুচে কালো রঙের পুরোনো জল। কিন্তু জল খুব গভীর নয়, মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ জেগে উঠেছে। সেই সব দ্বীপে বড় বড় গাছও আছে।

সুলেখা সেই জলাভূমির ধারে এসেও থামলো না। বিনা দ্বিধায় জলে নেমে গেল।

তার পায়ের চটি এবং হাঁটু পর্যন্ত শাড়ী ভিজিয়ে সে হেঁটে গেল জলের মধ্য দিয়ে। প্রথমে যে দ্বীপটা পড়লো, সেটাতেও সে উঠলো না।

এবারে জল আর একটু গভীর হলো। হাঁটু ছাড়িয়ে তার উরু ডুবে গেল। তবু তার ভয় নেই। সুলেখা সাঁতার জানে না।

তৃতীয় দ্বীপটার কাছে এসে সুলেখা জল ছেড়ে পাড়ে উঠলো। এখানে বেশ বড় একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ রয়েছে। তার তলাটা অন্ধকার মতন। সেইখানে সুলেখা তার কাঁধ থেকে ঝোলাটা নামিয়ে রাখলে। তারপর তেঁতুল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসলো বেশ নিশ্চিন্তভাবে।

সঙ্গে সঙ্গে সে আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

জায়গাটা এমনই যে এখানে সাপ খোপ থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। দুষ্টু লোকেরা সুলেখার বয়েসী মেয়েকে একলা বসে থাকতে দেখলে তার সর্বনাশ করে দেবে।

সেই রকম একটা লোক দেখেছিল সুলেখাকে। ইটখোলার ডান পাশে সে দাঁড়িয়েছিল। সুলেখাকে জংলা জায়গাটার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে সে অবাক হয়ে যায়। তারপর সে সুলেখাকে অনুসরণ করতে থাকে লুকিয়ে লুকিয়ে।

লোকটি দুষ্টু বা বদ কিনা তা ঠিক বলা যায় না। হয়তো এমনিতেই কৌতূহলে সে পিছু নিয়েছিল সুলেখার। একটি অচেনা যুবতী মেয়েকে জলার মধ্যে চটি জুতো শুদ্ধু নেমে যেতে দেখলে তো যে কারুরই কৌতূহল হবে।

লোকটিও জলে নেমে পড়ে আসছিল সুলেখার পেছনে পেছনে। সুলেখা যখন তেঁতুল গাছওয়ালা দ্বীপটায় উঠে পড়লো, তখন লোকটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে। সুলেখা একবারও পেছন ফিরে তাকায় নি। তাই লোকটাকে দেখতেও পায় নি।

সুলেখা সেখানে বসে পড়বার পর লোকটির চোখ লোভে চকচক করে উঠলো। এখান থেকে কেউ চ্যাচালে কোনো মানুষ জন সহজে শুনতে পাবে না।

কিন্তু লোকটি যেই সেই দ্বীপটায় উঠতে যাবে, ঠিক তখনই তার কাছা-কাছি জল তোলপাড় হয়ে উঠলো। তাল সামলাতে না পেরে লোকটি চিৎ হয়ে পড়ে গেল জলে। তারপরেই সেই শান্ত, পচা জলের দহে কী করে যেন দেখা দিল তীব্র স্রোত। সেই স্রোতের টানে সাঁ সাঁ করে ভেসে যেতে লাগলো লোকটি। সে ভালো সাঁতার জানে, তবু সেই স্রোতের সঙ্গে যুঝতে পারলো না। ভাসতে ভাসতে কোথায় সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুলেখা সে ভাবেই অজ্ঞান অবস্থায় বসে রইলো অনেকক্ষণ। ক্রমে ক্রমে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এলো। সেই তেঁতুল গাছটায় অনেক পাখীর বাসা। পাখীরা সব ফিরে এলো ঘরে। গাছের নিচে ঐ রকম একটি মেয়েকে বসে থাকতে দেখে যেন অবাক হয়ে ডাকাডাকি করতে লাগলো বেশী করে। একটা ধেড়ে ইঁদুর সুলেখার কোলের উপর দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। সে বুঝতেই পারে নি ওখানে কোনো মানুষ বসে আছে।

তারপর আর একটু রাত হতেই সমস্ত পাখির ডাক থেমে গেল। চতুর্দিক একেবারে চুপচাপ, নিস্তব্ধ। সেই সময় জ্ঞান ফিরে এলো সুলেখার।

সে কিন্তু এবারেও অবাকও হলো না, ভয়ও পেল না। তার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে। কে যেন তাকে ডাকছে। কে যেন তাকে কাছে আসতে বলছে।

ঠিক তিন দিন আগে রাত সাড়ে ন'টার সময় সুলেখা এসে দাঁড়িয়ে ছিল ওদের বাড়ির বারান্দায়। সেদিন আকাশ ছিল মেঘলা। এই রকম মেঘলা আকাশে যদি একটা দুটো তারা খুঁজে বার করতে পারে, তা হলে সুলেখার খুব আনন্দ হয়। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা খুঁজছিল।

তারা সে দেখতে পায় নি, তার বদলে সে দেখেছিল, মেঘের ওপর দিয়ে একটা সূক্ষ্ম আলোর রেখা ঘুরছে। প্রথমে সে ভেবেছিল কোনো এরোপ্লেন বুঝি। কিন্তু তার পরই মনে হয়েছিল প্লেনের তো সোজা যাবার কথা। আলোটা ঘুরছে কেন?

ঠিক তখনই সুলেখার মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠেছিল। আর সেই সঙ্গে মনে হয়েছিল, তাকে কেউ ডাকছে।

সে-ই প্রথমবার। তারপর থেকে এ রকম আরও কয়েকবার হয়েছে।

অন্ধকারের মধ্যে সুলেখা চারদিকে তাকালো। এভাবে সে কেন এসেছে তা সে নিজেই জানে না। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম ভাবটা আবার বাড়ছে।

সুলেখা ফিস ফিস করে বললো, আমি এসেছি! আমি এসেছি!

তখন তেঁতুল গাছের ঘন পাতা ভেদ করে একটা আলোর রেখা নেমে এলো নিচে। একটা ঠিক গোল বলের মতন আলো লাফাতে লাগলো তার সামনে।

সুলেখা সেই আলোটার দিকে হাত বাড়িয়ে আবার বললো, আমি এসেছি! আমি এসেছি!

তারপর সেই গোল আলোটা লাফিয়ে উঠে এলো সুলেখার বুকে। সুলেখার সারা শরীরে ঘুরতে লাগলো।

সুলেখার মনে হলো, কেউ যেন তাকে খুব ভালোবেসে আদর করছে। এরকম আদর সে কোনো দিন পায় নি। সে চোখ বুঁজে দারুণ তৃপ্তির সঙ্গে বলতে লাগলো, আঃ! আঃ!

সেই আলোটা অনেকক্ষণ ধরে খেলা করতে লাগলো সুলেখার বুকে। তার স্পর্শ যেন ঠিক কোনো মানুষের ছোঁয়ার মতন।

সুলেখা চোখ বুজেই জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? তুমি আমাকে কেন এখানে ডেকেছো?

কোনো উত্তর নেই। আলোটা এবার সুলেখার ঠোঁট ছুঁলো।

সুলেখা ফিস ফিস করে বললো, তুমি এত ভালো। তুমি যতবার ডাকবে, আমি ততবার আসবো। আঃ! আঃ!

তারপর আলোটা সুলেখার দুই চোখ ছুঁয়ে দিতেই সুলেখা আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

সুলেখার আবার যখন জ্ঞান ফিরলো, সে দেখলো, সে বসে আছে সেই অচেনা স্টেশানের একটা বেঞ্চে। স্টেশানের ঘাড়তে দেখলো রাত্তির সোওয়া আটটা বাজে। উল্টো দিক থেকে একটা ট্রেন আসছে।

সুলেখা এবারে অবাক হলো খুব। এখানে সে এলো কী করে? সেই জলাভূমির মধ্যে তেঁতুল গাছ, সেখান থেকে সে কখন ফিরলো, কী করে ফিরলো? কিংবা, সে কি আসলে অন্য কোথাও যায় নি, এই বেঞ্চতে বসেই এতক্ষণ ঘুমিয়েছে, আর সব ব্যাপারটাই স্বপ্নে দেখেছে?

কিন্তু সুলেখার শাড়ী কোমর পর্যন্ত এক দম ভেজা। তার পায়ের চটিও ভিজে জবজবে হয়ে আছে।

এবং কেউ যেন তাকে সত্যিই আদর করেছে তার প্রমাণ, তার সমস্ত শরীর জুড়ে রয়েছে এক অদ্ভুত সুন্দর ভালো লাগা। যে তাকে আদর করেছে, সে যদি আবার ডাকে, তাহলে সুলেখা নিশ্চয়ই আবার ছুটে যাবে। □

না-মানুষের পাঁচালি

নারায়ণ সান্যাল

একবার আমি আফ্রিকা থেকে নানান খাঁচা-ভর্তি জীবজন্তু নিয়ে ফিরছি—উটপাখি, জিরাফবাচ্চা থেকে শুরু করে কাঁকড়া-বিছে, বাদুড়, মাকড়শা—কী নেই আমার হেপাজতে? শ'দুয়েক খাঁচা, তাদের খাদ্য ও ঔষধপত্র মিলিয়ে সে এক এলাহি কাণ্ড! এই প্রকাণ্ড বাহিনীর যথোপযুক্ত খিদমৎ করতে দুজন আফ্রিকানও চলেছে আমার সঙ্গে, বিল আর জর্জ। যে জাহাজে ফিরছি তার নাম 'সী-কুইন' এবং তার ক্যাপ্টেন ছিলেন একজন আইরিশম্যান, ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌গ্রেগরি। ভদ্রলোক জন্তু-জানোয়ার একদম বরদাস্ত করতেন না। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। দু তরফেই। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে আমার ভাগ্যটাই বেশি খারাপ। কারণ আমি তাঁর ঔদাসীন্য, এমনকি ঘৃণাটাও হজম করে নিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তা পারেন নি। প্রায়ই নানান ছুতোয় ক্যাপ্টেন-সাহেব তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করতেন, সুযোগ পেলেই জানিয়ে দিতেন এইসব মনুষ্যেতর সহযোগী তাঁর জাহাজে চড়ায় তিনি ক্ষুব্ধ।

তবু আমি তাঁকে এড়িয়ে চলতুম। প্রথম কথা, আইরিশম্যানের সঙ্গে তর্ক করা বারণ! কেমন জানেন? আপনি যদি ঘটি হন তাহলে কাঠ-বাঙালদের আপনি এড়িয়ে চলবেন, আর যদি ইস্টবেঙ্গল-সাপোর্টার হন তাহলে কট্টর মোহনবাগান-ম্যানকে শতহস্ত দূরে রাখবেন। তা চাণক্য-পণ্ডিত বলুন না-বলুন। দ্বিতীয় কথা, লোকটা জাহাজের সর্বময় কর্তা—কে জানে কোন ছুতোয় বিপদে জড়িয়ে পড়ব। য়ুরোপের নানান চিড়িয়াখানার জন্য সংগৃহীত এই অ্যাত্তগুলি জীব নিয়ে এমনিতেই আমি নানাভাবে বিব্রত।

তবু জাহাজ যখন ইংলণ্ড উপকূলের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন মনে হল ঐ ভদ্রলোককে একটু শিক্ষা দিতে পারলে মন্দ হয় না।

ঘটনাচক্রে তিনি নিজেই সে সুযোগটা করে দিলেন। জাহাজ তখন ইংলিশ চ্যানেলের দোর-গোড়ায়। বাইরে প্রচণ্ড বর্ষণ, তাই ডেক ছেড়ে সবাই জড়ো হয়েছি ধূমপান-কক্ষে। টেলিভিশনে তখন 'রাডার-যন্ত্র' বিষয়ে একটা তথ্যমূলক প্রোগ্রাম হচ্ছে। কীভাবে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় শব্দ-তরঙ্গ ছুঁড়ে রাডার চোখ বুজে বলে দিতে পারে অদৃশ্য বস্তুটা কতদূরে আছে। রাডার যন্ত্রটা সে-আমলে নতুন। ফলে সবাই মন দিয়ে শুনছে; প্রোগ্রাম শেষ হতেই ক্যাপ্টেন আমার দিকে ইঙ্গিত করে ববকে বললেন, ইনি মনে করেন জীবজন্তুরা খুব চালাক। মানুষ যেমন রাডার বানিয়েছে তেমনি বিবর্তনের মাধ্যমে আজ থেকে এক কোটি বছর পরে কোনো জন্তু রাডার আবিষ্কার করবে।

আমি দেখলুম, ভদ্রলোক আমার কব্জায়! নির্লিপ্তভাবে বলি, তা যদি আমি প্রমাণ করতে পারি তাহলে কতটাকা বাজি হারবেন?

যেন জবর রসিকতা করেছি আমি। ক্যাপ্টেন অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন। তিনি নিশ্চিত জানতেন, আজ থেকে এক কোটি বছর পরে কোনো মনুষ্যেতর জীব যে রাডার যন্ত্রটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে এটা প্রমাণ করা নিতান্ত অসম্ভব। তাই হাসতে হাসতে বললেন, এক বোতল ম্যাগনাম-সাইজ হোয়াইট-হর্স হুইস্কি।

আমাদের টেবিলে আমরা ছিলুম পাঁচজন। আমি তাঁদের দিকে ফিরে বলি, আপনারা সাক্ষী রইলেন কিন্তু।

বব ওদের মধ্যে দারুণ ফুর্তিবাজ। তার চোখেমুখে কথা। আগ্-বাড়িয়ে বললে, সাক্ষী থাকতে রাজি আছি, যদি শ্বেতাশ্বের ছিটে-ফোঁটার প্রতিশ্রুতি পাই।

আমি ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বলি, ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌গ্রেগরি, ঐ সঙ্গে যদি আমি প্রমাণ দিই জীবজন্তুরা রাডারের মতো ইলেকট্রিসিটি, আর্দেন-ড্যাম, ডাইভিং বেল এবং ফ্রিজিডিয়ারও বানাতে পারবে তাহলে আপনি কি আমার বন্ধুদেরও এক এক বোতল হোয়াইট-হর্স উপহার দেবেন?

ম্যাক্‌গ্রেগরি আমার এ পাগলের প্রলাপে উচ্চহাস্যে ফেটে পড়ে। বলে, আলবাৎ! তবে প্রমাণ দিতে না পারলে আপনাকে দিতে হবে পাঁচ বোতল মদ! কী? রাজি?

আমি ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলি, আই অ্যাক্সেপ্ট দ্য চ্যালেঞ্জ!

ম্যাক্গ্রেগরি আমার হাতটা চেপে ধরে বললে, ও. কে.!

আমাদের শেষদিকের বাক্যবিনিময় কিছু উচ্চকণ্ঠে হয়ে থাকবে; কারণ অনেকেই ঘনিয়ে এলেন জানতে, বাজিটা কী-নিয়ে। ম্যাক্ বলে, কিন্তু এ বিতর্কের বিচারক হবে কে?

বব বলে, কেন আমি? এতো সহজ বিচার! যেই হারুক বিচারক এক বোতল হুইস্কি পাবে।

ম্যাক্ বললে, সেই জন্যেই তোমাকে বিচারক করা চলবে না। এমন ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক চাই যিনি চুলচেরা বিচার করবেন! রসো, আমি আসছি...

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ম্যাক্ ফিরে এল। তার সঙ্গে এক পলিতকেশ বৃদ্ধ। সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, জেন্টেলমেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য, স্যার ডোনাল্ড লরেন্স এ জাহাজের যাত্রী। উনি রিটায়ার্ড চীফ্ জাস্টিস্, সমান-সমান হলেও তিনি নির্দ্বিধায় তা ঘোষণা করার হিম্মৎ রাখেন!

ইতিমধ্যে খবরটা মুখে মুখে চাউর হয়ে গেছে। বাইরে অশ্রান্ত বর্ষণ, ভিতরে নিষ্কর্মা অলস যাত্রী। জাহাজ এগিয়ে চলেছে একটানা। নতুন খেলার গন্ধে সবাই ঘনিয়ে আসে। হাতাহাতি করে চেয়ার-টেবিল সরিয়ে এটাকে একটা মেকি আদালতের রূপ দেয়। মাঝখানে স্যার লরেন্সের বিচারাসন। তাঁর সামনেই টেবিলে কোনো ফোরম্যানের কাছ থেকে হাতিয়ে আনা একটা হাতুড়ি। চীফ স্টুয়ার্ড সাজল নকিব, নেভাল এঞ্জিনিয়ার পেশকার। বিচারকের দুই প্রান্তে আমরা দুই কাউন্সেলার, ম্যাক্গ্রেগরি ও আমি। যারা পোকার খেলছিল তারাও তাস ফেলে এগিয়ে আসে।

স্যার লরেন্স হাতুড়িটা টেবিলে ঠুকে হাঁক পাড়েন: অর্ডার! অর্ডার!

সবাই সামলে-সুমলে বসে। বাক্যালাপ বন্ধ হয়।

জজ বলেন, 'সী-কুইন' আদালতে শুনানি শুরু হচ্ছে। কেউ গণ্ডগোল করবেন না। এক নম্বর মামলা—মানুষ বনাম না-মানুষ।

ম্যাক্গ্রেগরি ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আজ্ঞে না, ধর্মাবতার! মামলাটা ম্যাক্গ্রেগরি ভার্সেস্ ডারেল!

জজ তাকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন: য়ু সাট আপ! আদালতের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে আদালত অবমাননার দায়ে তোমাকে চ্যাঙদোলা

করে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে—

পেশকার ফোড়ন কাটে : বিনা লাইফ বেল্টে!

নকিব ফুটনোট দাখিল করে, বেছে বেছে সমুদ্রের যেখানে মানুষখেকো হাঙরের ঝাঁক!

ম্যাক্‌গ্রেগরি থতমত খেয়ে বসে পড়ে।

জজ-সাহেব বলেন, বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষে কাউন্সেলাররা হাজির?

নকল-নকিব নেভাল এঞ্জিনিয়ার যেন তার অদৃশ্য নথি দেখে বলল, ইয়েস্ য়োর অনার! বাদীর পক্ষে আছেন ব্যারিস্টার ম্যাক্‌গ্রেগরি, বিবাদীর পক্ষে এ্যাডভোকেট ডারেল।

এতক্ষণে মালুম হল ম্যাক্‌গ্রেগরির। উঠে দাঁড়িয়ে নিখুঁত কায়দায় 'বাও' করে বললে, ইয়েস্ য়োর অনার! মানুষের তরফে আমি ওকালৎনামা পেয়েছি।

জজ গম্ভীরভাবে বলেন, ইজ দ্য ডিফেন্স রেডি অ্যাজ-ওয়েল?

আমি বাও করে বলি, ডিফেন্স ইজ অলওয়েজ রেডি মি-লর্ড!

জজ বললেন, মিস্টার প্রসিকিউটিং কাউন্সেল! আপনি কি একটি প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে ইচ্ছুক?

ম্যাক্ বললে, আজ্ঞে হাঁ। জীবজন্তুরা স্বভাবতই নির্বোধ। যেমন গাধা, যেমন গরু, যেমন উল্লুক! মানুষের যখন বুদ্ধি কম থাকে তখন আমরা তাকে ঐসব নামে বিভূষিত করি : গাধা-গরু-বাঁদর-উল্লুক! কিন্তু এই জাহাজে উপস্থিত জনৈক মনুষ্যেতর জীবের দরদা—

—অবজেকশন, য়োর অনার! —আমি আপত্তি দাখিল করি।

জজ বলেন, অন হোয়াট গ্রাউণ্ডস্?

—'মনুষ্যেতর' শব্দটা ইর্‌রেলিভ্যান্ট, ইনকম্‌পিট্যান্ট অ্যাণ্ড ইম্মেটিরিয়াল! মানুষের চেয়ে না-মানুষরা 'ইতর' কিনা সেটাই তো এ মামলার বিচার্য বিষয়!

জজ গম্ভীর হয়ে বললেন, অবজেক্‌শন সাসটেইন্‌ড।

একটা ঢোঁক গিলে ম্যাক বলে, বেশ, না হয় 'মনুষ্যেতর' শব্দটা আপাতত ব্যবহার করলুম না। আমি বলতে চাই, বিপক্ষ দলের কাউন্সেল যে এই অমানুষদের—

আবার খাড়া হই আমি : অবজেকশান য়োর অনার। 'অমানুষ' শব্দটাতে এমন একটি 'যোগরূঢ়' ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়েছে যাতে সেটা শুধু খারাপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ও শব্দটা চলবে না।

জজ সংক্ষেপে বলেন, সেম রুলিং।

ম্যাক্ শ্রাগ করে বলে, যাচ্চলে! তাহলে তোমাদের ঐ 'ওনাদের' কী নামে ডাকব?

জজ বলেন, 'না-মানুষ' নামে।

—তা বেশ, তাই সই। এ জাহাজের যাত্রী মিস্টার জি. ডারেল বলছেন ঐ না-মানুষেরা এক কোটি বছরের মধ্যে মানুষের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। তারা ডাইভিং বেল, ইলেকট্রিসিটি, আর্দেন ড্যাম, ফ্রিজিডেয়ার এবং রাডার-যন্ত্র আবিষ্কার করবে। এটা তিনি যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করবেন। যদি প্রমাণ করতে পারেন তাতে আমি পাঁচ বোতল ম্যাগনাম-সাইজ হোয়াইট হর্স হুইস্কি বাজি হারব। যদি প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে তিনি তাই হারবেন।

জজ বলেন, আমি এই মুহূর্তেই মামলা ডিস্‌মিস্ করে দিতাম। আজ থেকে এক কোটি বছর পরে কী হতে পারে না পারে সেটা কোনো বিচারালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত হতে পারে না। জুডিশিয়ারির কেরামতি শুধু অতীত নিয়ে। ফলে এ মামলা এখানেই ডিস্‌মিস্ হওয়ার যোগ্য। তবু যেহেতু আমি একপক্ষের সওয়াল শুনেছি, তাই আমি অপর পক্ষের সওয়ালও শুনব। মিস্টার ডারেল, আপনি কিছু বলবেন?

—বলব, মি. লর্ড। আমি বলতে চাই, এক কোটি বছর পরে কী হতে পারে সেটা প্রমাণ না করে যদি আমি প্রমাণ করি—না-মানুষেরা ইতিমধ্যেই ঐ আবিষ্কারগুলি করেছে, তাহলে—

জজ সাহেব ঝুঁকে পড়ে বলেন, তার মানে আপনি বলতে চান, না-মানুষেরা ঐ পাঁচটি আবিষ্কার ইতিমধ্যেই করেছে, এটা আপনি প্রমাণ করবেন?

আমি বললুম, হ্যাঁ।

ম্যাক আগ্ বাড়িয়ে বললে, তাহলে পাঁচ বোতল নয় হুজুর, এ জাহাজের সবাইকে আমি আজ সান্ধ্য ককটেল পার্টিতে নিমন্ত্রণ করছি—যে যত ইচ্ছে মদ গিলবেন। বিল মেটাবার দায় আমার!

সবাই সমস্বরে চীৎকার করে ওঠে: ব্রেভো! ব্রেভো!

জজ আমার দিকে ফিরে বলেন, আপনি এ বিষয়ে কী বলেন?

আমি বলি, নিমন্ত্রণ তো হয়েই গেছে ধর্মাবতার! মামলায় হারলে বিলটা না হয় আমিই মেটাবো।

দর্শকের সারিতে এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, : তার মানে কি স্বয়ং জজসাহেব আজ সন্ধ্যায় আকণ্ঠ অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাবেন ?

শুনলাম, তিনি লেডি লরেন্স, বিচারকের ধর্মপত্নী। স্যার লরেন্স টেবিলে হাতুড়িটা ঠুকে বললেন, অর্ডার! অর্ডার!

অতঃপর শুরু হল আমার সওয়াল।

—ধর্মাবতার! আমার এক নম্বর সাক্ষী মহাবিজ্ঞানী শ্রীমান বাদুড়েশ্বর বিহঙ্গোপম।

নকিববেশী চীফ স্টুয়ার্ড বেইলি কায়দামাফিক হাঁক পাড়ল : এক নম্বর সাক্ষী বাদুড়গোপাল হা-জি-র ?

তৎক্ষণাৎ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল বিল্লু। আমার নিগ্রো ভৃত্য। জন্তু-জানোয়ারের খিদমৎ করতে করতে যে-ছোকরা আমার সঙ্গে চলেছে। তার হাতে একটা খাঁচা।

সাক্ষী যে সশরীরে হাজির হবে এটা কেউই আশঙ্কা করেনি। আমি বললুম, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, ছোটাছুটি করবেন না। চুপচাপ বসে সার্কাস দেখুন।

বাদুড়েশ্বরের পায়ে একটা হালকা অথচ মজবুত নাইলনের সুতো বাঁধা ছিল। ছেড়ে দিতেই সে বাতাসে উড়ল। আমার সাবধানবাণী সত্ত্বেও কয়েকজন মহিলা টেবিলের তলায় সেঁদিয়ে গেলেন; দু-একটা মর্মবিদারক ইন্টারজেক্‌শানও শোনা গেল এখানে ওখানে। বাদুড়েশ্বর হল-কামরার এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত বার কয়েক পারাপার করল। অনেকগুলি বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরছিল, সে কোথাও ঠোক্কর খেল না, এরপর আমার নির্দেশে বিল্লু সুতো ধরে টেনে ওকে নামালো, খাঁচায় পুরলো।

আমি পুনরায় সওয়াল শুরু করি, ধর্মাবতার, যে-খেলাটা আমার এক নম্বর সাক্ষী দেখালো সেটা সে নীরন্ধ্র অন্ধকারে চোখ বেঁধেও দেখাতে পারে।

বিশ্বাস না হয়, ঘরের সব বাতি নিবিয়ে দিয়ে টর্চ হাতে প্রতীক্ষা করুন।

একাধিক মহিলা সমস্বরে বলে ওঠেন, আমরা মেনে নিলাম! কী বলেন ক্যাপ্টেন সাহেব?

ম্যাক্ বলে, হ্যাঁ অন্ধকারেও ওরা ধাক্কা খায় না, আমি লক্ষ করেছি, কিন্তু তাতে কী প্রমাণ হল?

আমি বলি, এ থেকে প্রমাণ হল যে বাদুড় রাডার-এর ব্যবহার জানে!

ম্যাক্ খিঁচিয়ে ওঠে: ইল্লি! মামদো-বাজি নাকি? হাও?

—অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, বাদুড়ের চোখ নেই। সেটা ঠিক নয়, চোখ ওদের আছে, তবে খুব ছোট। লোমে ঢাকা থাকে বলে সহজে নজরে পড়ে না। সে চোখের দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ নয় যে এমন ম্যাজিক সে দেখাতে পারে। তাহলে সে কীভাবে এই অসাধ্যসাধন করে? ষোড়শ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের অন্যতম অসামান্য ধ্বজাধারী লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বলেছিলেন, মানুষ যদি কোনোদিন আকাশে ওড়ে তবে সে পাখির মতো উড়বে না, বাদুড়ের মত উড়বে। অন্য কোনো বিহঙ্গ নয়, স্তন্যপায়ী বাদুড়ই হবে উড্ডয়ন-বিদ্যায় মানুষের একমাত্র আদর্শ! তার আরও দুশ' বছর পরে জীববিজ্ঞানী স্প্যালাঞ্জানি—তিনিও ইতালীয় লেওনার্দোর দেশের মানুষ, খুঁটিয়ে দেখতে চাইলেন বাদুড় কীভাবে ধাক্কা না-খেয়ে এমনভাবে উড়তে পারে। আর সবাই নীরন্ধ্র অন্ধকারে দেওয়ালে ধাক্কা খায়। বাদুড় খায় না। কেন?

তিনি কয়েকটি বাদুড়কে নিষ্ঠুরভাবে অন্ধ করে উড়িয়ে দিলেন। দেখলেন, তা সত্ত্বেও তারা ঐভাবে উড়তে পারছে। দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে না। উড়ন্ত সেই অন্ধ বাদুড়ের দিকে ছাতা জুতো ছুঁড়ে তাকে আহত করা যাচ্ছে না—সে ঠিকই পাশ কাটিয়ে সরে যেতে পারছে। কিন্তু কীভাবে? স্প্যালা-ঞ্জানি তার কোনো বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। শুধু তিনি নয়, আরও দুশ' বছর ধরে কোনো জীববিজ্ঞানীই এই সমস্যার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

তারপর বর্তমান শতাব্দীতে 'রাডার' আবিষ্কৃত হল। রাডার কী? এই যন্ত্রের সাহায্যে চতুর্দিকে কিছু শব্দতরঙ্গ ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং কোনো কিছুতে প্রতিহত হয়ে সেই শব্দতরঙ্গ যখন ঐ যন্ত্রে ফিরে আসে তখন যান্ত্রিক নির্দেশে বলে দেওয়া যায়, যে-বস্তুতে প্রতিহত হয়ে শব্দতরঙ্গ ফিরে এসেছে সেটা কত দূরে। এই রাডার আবিষ্কৃত হতেই একদল জীববিজ্ঞানীর মনে হল, তাহলে বাদুড়ও কি তাই করে?

শুরু হল নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। চোখ বেঁধে দিলে কী হয় তা আগেই জানা ছিল; এবার চোখ খুলে রেখে কানের ফুটো দুটি বন্ধ করে ঘরের বদ্ধ ঘটাকাশে তাকে ওড়ানো হল। বেচারা বাদুড়। সে এদিকে-ওদিকে ক্রমাগত ধাক্কা খেল। অর্থাৎ প্রমাণিত হল ঐ অত্যদ্ভুত উড্ডয়ন-সাফল্যের সঙ্গে বাদুড়ের শ্রবণযন্ত্র ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। এরপর চোখ কান খুলে রেখে শুধু মুখটা বেঁধে তাকে উড়তে দেওয়া হল। আশ্চর্য! এবারও সে ক্রমাগত ধাক্কা খেল! অর্থাৎ শ্রবণযন্ত্রের মতো তাহলে ওর বাগ্‌যন্ত্রও এ কাজের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এলেন: বাদুড় মুখ দিয়ে শব্দ তরঙ্গ ছাড়ে এবং কান দিয়ে শোনে কতদূর থেকে প্রতিহত হয়ে সে শব্দ ফিরে আসছে। এ জন্যই সে ধাক্কা খায় না। অর্থাৎ মানুষের পূর্বেই বাদুড় ঐ রাডার যন্ত্রটা আবিষ্কার করেছে!

সওয়ালের এই পর্যায়ে ম্যাক্‌গ্রেগরি প্রতিবাদ করে ওঠে: অবজেকশান, য়োর অনার! ওঁর বাদুড়টা যদি মুখে শব্দ করে থাকে তাহলে ঘরশুদ্ধ আমরা কেউই তা শুনতে পাইনি কেন?

আমি বললুম, হুজুর! বিজ্ঞানীরা বলছেন, তার একমাত্র হেতু বাদুড় যে শব্দতরঙ্গ ছাড়ে তা 'সুপারসনিক', অতি সূক্ষ্ম! অর্থাৎ সে শব্দ-তরঙ্গ ওরাই শুধু শুনতে পায়, এই বাদুড়েতর মানুষের শ্রবণযন্ত্র অত উন্নতমানের নয়।

আমার ঐ 'বাদুড়েতর' বিশেষণটায় ম্যাক্‌গ্রেগরি কোনো প্রতিবাদ করল না। স্পষ্টই বোঝা গেল, সে ঘাবড়ে গেছে। একটু ভেবে নিয়ে বলল, কিন্তু আপনি যা বলছেন তা তো হতে পারে না!

—কেন পারে না?

—একটু আগেই আমরা টি. ভি.-তে দেখলুম যে, রাডার যন্ত্রে এমন ব্যবস্থা থাকে যাতে শব্দতরঙ্গ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দগ্রাহক যন্ত্রটা ইলেকট্রনিক-সার্কিটে বন্ধ হয়ে যায়; যাতে প্রাথমিক শব্দটা ধারক যন্ত্রে ধরা পড়ে না, শুধু প্রতিহত শব্দতরঙ্গটাই ধরা পড়ে। বাদুড়ের মস্তিষ্কে তো ইলেক্‌ট্রনিক সার্কিট নেই। ফলে সে দুজাতের শব্দতরঙ্গ শুনবে। এক নম্বর তার মুখ-নিঃসৃত প্রাথমিক শব্দ, দুনম্বর বস্তুতে প্রতিহত প্রতিধ্বনি। তাহলে তো সব তালগোল পাকিয়ে যাবে।

আমি বললুম, এ সমস্যার কথাও জীববিজ্ঞানীরা ভেবেছেন। অতি সম্প্রতি সে সমস্যার সমাধান হয়েছে। দেখা গেছে, বাদুড়ের কর্ণপটহে একটি ক্ষুদ্র মাংসপেশী আছে যা এই কাজটা করে থাকে। মুখ দিয়ে শব্দতরঙ্গ ছেড়ে

দেওয়া মাত্র প্রতিবর্তী প্রেরণায় (reflex action এ) ঐ মাংসপেশী সক্রিয় হয়ে ক্ষণিকের জন্য কর্ণকুহরের দ্বারটি বন্ধ করে দেয়। পরমুহূর্তে সেই ভাল্‌বটি সরে যায়, যাতে খণ্ডমুহূর্তের ব্যবধানে ঐ প্রতিধ্বনিটা সে শুনতে পায়।

সবাই নড়ে চড়ে বসে। ম্যাক্‌গ্রেগরি একেবারে স্ট্যাচু। আমি বিচারকের দিকে ফিরে একটি 'বাও' করে বলি, ধর্মাবতার। মানুষ রাডার আবিষ্কার করেছে বিংশ শতাব্দীতে! কিন্তু বাদুড় করেছে পাঁচ কোটি বছর আগে। ইয়োসিন যুগের পাথরের খাঁজে কিছু প্রাগৈতিহাসিক বাদুড়ের পূর্বপুরুষের জীবাশ্ম সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে! দেখা গেছে তারাও স্তন্যপায়ী এবং তারাও একই ভাবে উড়ত। আমার সওয়াল শেষ হয়েছে ধর্মাবতার। এবার আপনি রায় দিন!

বিচারক বললেন, এ তো শুধু ফার্স্ট রাউণ্ডের খেলা হল। তারপর?

—জাস্ট এ মিনিট!—দাঁড়িয়ে উঠেছে বার-ম্যান! যেন হাই কোর্টের উপর সুপ্রীম কোর্ট! গটগট করে সে এগিয়ে এসে আমার সামনে রাখল একটা ম্যাগনাম সাইজ হোয়াইট-হর্স হুইস্কি। বলল, গলাটা ভিজিয়ে নিন স্যার! বিল আপনাকে মেটাতে হবে না!

* * * *

সেকেণ্ড রাউণ্ড! আর্দেন ড্যাম! এবার আমার সাক্ষী বীভার! কানাডা ও উত্তর আমেরিকায় ওদের বাস। এককালে প্রায় সারা পৃথিবীতে ছিল। ওর চামড়ার লোভে মারতে মারতে ওদের কোণঠাসা করে ফেলেছি! বীভার থাকে 'বীভার লজে'। নিজেরাই তারা সে বাসা বানায়। তার অর্ধেক জলের নিচে, অর্ধেক উপরে। ওরা উভচর। জলের নিচে বীভার লজ হাত পাঁচেক চওড়া, উপর দিকটা সূচালো। পাথর ও গাছের ডাল কুড়িয়ে এনে ওরা এই লজ বানায়। এক-এক লজে থাকেন একজন কর্তা-মশাই, দু-তিনটি রাণী আর গুটিকতক ছানা পোনা নিয়ে। মজা হচ্ছে এই যে, ছানা-পোনাদের মধ্যে যে কটা মদ্দা তারা একটু লায়েক হলেই বাপ বলে, 'বাপু হে! এবার নিজের লজ নিজে বানাও।'

লায়েক ছেলে রাগ করে না। জানে, এটাই অলিখিত আইন। এক-একটা বীভার-লজের চৌহদ্দি সীমাবদ্ধ। বীভার-সংখ্যা এবং ঐ চৌহদ্দিতে প্রাপ্তব্য খাদ্যবস্তুর একটা গাণিতিক সম্পর্ক আছে। ভিড় বেশি হলে সবাই-কেই না খেয়ে মরতে হবে। তাই এই প্রাকৃতিক আইন ওরা মেনে চলে। লায়েক ছেলে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। কাছে-পিঠেই যদি কোনো

বদ্ধ জলা বা হ্রদ পায়, যেটা অন্য কোনো বীভার-লজের এক্তিয়ারভুক্ত জমি নয়, তাহলে সেখানেই একটা লজ বানায়। এমন তৈরি লজ পেলে কোন্-না মাদি বীভার আকৃষ্ট হবে ? ফলে ঐ লায়েক ছেলে নতুন লজে নতুন করে সংসার পাতে।

কিন্তু যদি কাছে-পিঠে তেমন হ্রদ না থাকে ?

তখনই ওকে আর্দেন-ড্যাম বানাতে হয়। প্রথমেই ভৌগোলিক অবস্থান-টার একটা জরিপ করে নেয়। সম্‌ঝে নেয়, বর্ষার জলধারা কোন পথে নিকাশ হয়। তারপর প্রকাণ্ড বড় বড় গাছ কেটে নামায়। বড় বড় ডালের ছোট খাটো পাতা বা ছোট ডাল ছেঁটে টুকরো বানায়, যাতে সেগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে অথবা নদীতে ভাসিয়ে এগিয়ে নেওয়া চলে। এ ভাবেই সে গাছের ডাল সাজিয়ে ঐ নিকাশি নালার মুখটা বন্ধ করে দেয়। এরপর পাথর গড়িয়ে নিয়ে এসে ফাঁক-ফোঁকর বন্ধ করে। এবং তারপর কাদামাটি এনে ঐ পাথরের মাঝের ফাঁকগুলো বন্ধ করে। নিরেট-নিশ্ছিদ্র দেওয়াল, যেন ছয়-এক সিমেন্ট-বালির গাঁথনি! শুধু কেন্দ্রীয় অবস্থানে কিছুটা অংশে 'মর্টার-জয়েন্ট' করা হয় না। সেখানে থাকে একটা খাড়া ফোকর বা ভার্টিকাল শ্যাফ্‌ট। বায়ু চলাচলের জন্য। বাঁধটা ওরা বর্ষা আসার আগেই শেষ করে। বর্ষার ঢল নামলে দেখা যায়, সেখানে একটা কৃত্রিম জলাশয় তৈরী হয়েছে।

লজটা তার কিছুটা জলের নিচে, কিছুটা উপরে। এমন কি দুরন্ত শীতে যখন জলের উপরিভাগ জমে বরফ হয়ে যায় তখনও ঐ 'ভার্টিকাল শ্যাফ্‌ট' দিয়ে বায়ু গমনাগমনের সুড়ঙ্গ থাকে। এই লজের ভিতরে ওদের বেডরুম, ডাইনিং রুম, নার্সারি সবই আছে—মায় শীতকালের জন্য মজুত প্রকাণ্ড ভাঁড়ার।
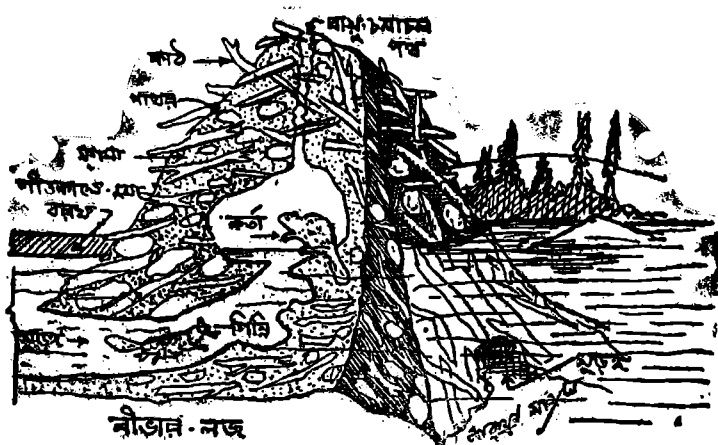
লজ সংলগ্ন ড্যামগুলি কত বড় হয়? দু-এক মিটার থেকে শুরু করে অনেক বড় হতে পারে। আমেরিকার জেফারসন নদীতে একটি বাঁধ বোধহয় ওদের জগতের রেকর্ড। সেটা দৈর্ঘ্যে 650 মিটার!

—ধর্মাবতার! আমি প্রমাণ করতে পারি, বীভার এই 'আর্দেন-ড্যাম' এবং বীভারলজ বানাতে শুরু করেছে মানুষ মাটির বাঁধ তৈরি করায় হাতেখড়ি দেওয়ার আগেই। শুনুন...

জজসাহেব বাধা দিয়ে বললেন, প্রয়োজন হবে না। সেকেণ্ড রাউণ্ড আপনি জিতেছেন। এবার কোয়ার্টার ফাইনাল? ইলেকট্রিসিটি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ইলেকট্রিসিটি!

অনেক জীব বিবর্তনের তাগিদে ইলেকট্রিসিটি আবিষ্কার করেছে, যখন মানুষ কাঁচা মাংস খেত, গায়ে জামা-কাপড় দিত না। যেমন ধরা যাক, 'টর্পেডো মাছ'। দেখলে মনে হয়, একটা সসপ্যান বুঝি স্টীমরোলারের তলায় চাপা পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। এরা অল্প জলে বসবাস করে। বালির

মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকে শিকারের অপেক্ষায়। মনে আছে, একবার গ্রীস উপকূলে এই জীবটির প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় পেয়েছিলুম। সমুদ্রের ধারে একটা বালিয়াড়ির উপর বসে একজন গ্রীক মৎস্যজীবীর বিচিত্র শিকার পদ্ধতি লক্ষ করছিলুম। সে তেফলা একটা বর্শা নিয়ে হাঁটুজলে হেঁটে হেঁটে মাছ ধরছিল। এখানে জলে ঢেউ নেই, সমুদ্র হ্রদের মতো শান্ত। লোকটা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা বড় মাছ গেঁথে তুলেছে এবং একটা অক্টোপাস। জেলেটা মাছ ধরতে ধরতে ক্রমশ আমার দিকেই এগিয়ে আসছিল। যখন মাত্র ফুট-ত্রিশেক দূরে তখন দেখি সে বর্শাটা মাথার উপর তুলে প্রস্তর মূর্তিতে রূপান্তরিত। নিশ্চিত সে জলের তলায় একটা বড় জাতের মাছ দেখেছে। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই—'বাবাগো! মাগো! মেরে ফেলল গো!'—চিৎকারে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সে জলে শুয়ে পড়ল। পর মুহূর্তেই বর্শাটা ফেলে দিয়ে খবল্‌-খবল্‌ করতে করতে সে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এল ডাঙায়। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। তার সেই মরণান্তক চিৎকার শুনে আধমাইল দূরের মানুষও ছুটে এসেছে। ওরা উত্তেজিত স্বরে কী যেন বলাবলি করছে। ভাষাটা বুঝিনি, সেটা গ্রীক। আক্ষরিক অর্থেও। তবে লক্ষ করে দেখি, সবাই অতি সাবধানে ইতি-উতি চাইতে চাইতে বালিতে পা ফেল্‌ছে। কী ব্যাপার? একজন ভাঙা ভাঙা ফ্রেঞ্চ বলতে পারল। তার কাছ থেকে জানা গেল, এখানে টর্পেডো-মাছ আছে। বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে থাকে, সহজে নজর হয় না। শত্রুকে আক্রমণ করে ইলেকট্রিক ডিসচার্জে। অথচ আশ্চর্য! ওরা নিজেরা সে শক্‌ খায় না।

অবশ্য ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারী হচ্ছেন 'ইলেকট্রিক ঈল'। এরা কিন্তু আদৌ 'ঈল' নয়, মাছ। যদিও দেখতে ঈল এর মতো। লম্বা, কালো, প্রায় সাপের মতো দেখতে। সাকিন—দক্ষিণ আমেরিকার কোনো কোনো নদী। দৈর্ঘ্যে আট ফুট পর্যন্ত হয়, গতরে পূর্ণবয়স্ক মানুষের জাঙুর মাপ! এদের সম্বন্ধে অনেক গল্প চালু আছে, অধিকাংশই অতিরঞ্জন, তবে 'ইলেকট্রিক ডিসচার্জে' এরা একটা ঘোড়াকে পেড়ে ফেলতে পারে, মানুষকে তো বটেই।

একবার ব্রিটিশ গায়নাতে আমি একটি ইলেকট্রিক ঈল জোগাড় করেছিলুম। ধরিনি, কিনেছিলুম। জায়গাটা আমার হেড-কোয়ার্টার্স থেকে মাইল পনের দূরে। একটা আদিবাসিদের গ্রাম। ওরা জীবজন্তু জ্যান্ত ধরায় ভারি দড়। আমাকে অনেকবার অনেক দুর্লভ জীব সরবরাহ করেছে।

এবারও দিল একটা পোশমানা সজারু, আর নানান জাতের পাখি। তারপর ওদের সর্দার বললে, 'বিজলি ঈল' আছে, নেবেন হুজুর? তবে দামটা—

আমি বাধা দিয়ে বলি, দামের জন্য আটকাবে না, নিয়ে এস।

বস্তুত লণ্ডন জু-তেও ইলেকট্রিক ঈল নেই। এই দুর্লভ জীবটির সাক্ষাৎ বহুবার পেয়েছি; কিন্তু ধরতে পারিনি। আসলে ছয় শত ভোল্ট বিদ্যুৎ-বজ্র দিয়ে যে জীব শত্রুর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত, তাকে কেমন করে ধরব বুঝে উঠতে পারিনি।

লোকটা নিয়ে এল বেতে বোনা খাঁচায় করে একটা মাঝারি সাইজ ঈল। মনে হল একবারে তিনি ৪৪০ ভোল্ট ছাড়তে পারবেন! দাম মিটিয়ে দেবার সময় তিনি আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন শুধু। সর্দার বলল, খুব সাবধানে একে নিয়ে যাবেন।

কিছু পাখি, গাছ-সজারু আর ঈলটাকে নিয়ে আমরা রওনা দিলুম ক্যানোয় করে। যাত্রার মাঝামাঝি সময় ঐ বেতের খাঁচা থেকে কী করে জানি ঈলটা বেরিয়ে পড়ে। আমাদের কারও নজরে পড়েনি; সবার আগে সেটা নজরে পড়েছে ঐ গাছ সজারুটার। তিন লাফে সেটা আমার মাথায় চড়ে বসেছে। ঠিক তখনই নজর হল ঈলটা তীর বেগে আমার দিকে ধেয়ে আসছে। আমি স্প্রিং করে শূন্যে এক লাফ মারলুম। সজারুটা অতি ঘড়েল, আমি লাফ মারবার উপক্রম করতেই বেটা আমার চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরেছে। ইতিমধ্যে ঈলটাও মারলে একটা লাফ। মুহূর্তে নদী গর্ভে!

একমুঠো টাকা জলে গেল। তা যাক! সেই গ্রীক ছোকরার মতো আমাকে যে চিল-চেঁচানো চেঁচাতে হয়নি ইয়েল্লেগেই ঈল প্রভুকে লাখ লাখ সুক্রিয়া!

তার অনেকদিন বাদে একটি বিজলি ঈল এসেছিল আমার হেপাজতে। অনেক কসরৎ করে, শক না খেয়ে তাকে পৌঁছে দিয়েছিলুম লণ্ডন জু-তে। ওর খাদ্য ছিল জ্যান্ত মাছ। মনে আছে, প্রতিদিন ঘাড় ধরে সে ঠিক খাওয়ার সময় বেশ চঞ্চল হয়ে উঠত। চক্রাকারে পাক খেত চৌবাচ্চায়। দৈর্ঘ্যে সে ফুট পাঁচেক। আট দশ ইঞ্চি লম্বা মাছ অনায়াসে গিলে ফেলত। তার আহার পদ্ধতিটা বড় বিচিত্র। জলে জ্যান্ত মাছটাকে ছেড়ে দিলেই সে স্তব্ধ হয়ে যেত। মড়ার মতো ভাসতো। নড়চড়ার লক্ষণই নেই। নিদারুণ ঔদাসীন্যে সে মাছটির জলকেলি উপভোগ করত। ঘুরতে ঘুরতে মাছটা যেই ওর হাত খানেক দূরত্বে আসত, অমনি ঈলটার সর্বাঙ্গ একবার থরথর

করে কেঁপে উঠ্‌ত। যেন ওর দেহের ভিতর একটা শক্তিশালী ডায়নামো পূর্ণবেগে চালু হল। চক্ষের নিমেষে দেখতাম মাছটা নিথর হয়ে গেছে। বজ্রাহত মানুষ যেমন জানতে পারে না কীভাবে মৃত্যু এগিয়ে এল। ধীরে ধীরে উল্টে যেত মাছটা। ভেসে উঠত জলতলে। অতি মন্থর গতিতে তখন ঈলটা এগিয়ে আসত এবং মুখব্যাদান করত। পরমুহূর্তেই যেন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার পাইপে কিছু ধুলোবালি ঢুকে গেল। মাছটার আর চিহ্নমাত্র নেই!

আমার দীর্ঘ সওয়ালে ম্যাক্‌গ্রেগরি একবারও বাধা দেয়নি। এখন সে নড়ে চড়ে বসতেই আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলি, ইয়েস ক্যাপ্টেন। বুঝেছি আপনার বক্তব্য। প্রমাণ চাই! এই তো! সৌভাগ্যক্রমে প্রমাণ আছে; এই জাহাজেই। আমি ইতস্তত করছিলাম শুধু এজন্য যে ওর খাঁচাটা বড় পল্‌কা—একটা দুর্ঘটনা-না ঘটে যায়। তা হোক, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া…

সমগ্র জনতা একযোগে হাঁ হাঁ করে ওঠে। ম্যাক বলে, থাক! আপনাকে আর কেদ্দানি দেখাতে হবে না। এ জাহাজে ভালমন্দ কিছু ঘটে গেলে আমিই দায়ী হব! কিন্তু ডাইভিং বেল?

(ঈল অবশ্য সেবার আমার হেপাজতে ছিল না আদৌ!)

ইয়েস! ডাইভিং বেল। সেমি ফাইনাল আইটেম: ডাইভিং বেল।

ধর্মাবতার, আমি প্রমাণ করব মানুষের অনেক অনেক আগে না-মানুষেরা ডাইভিং বেল আবিষ্কার করেছে। 'ডাইভিং বেল' কী? এর সাহায্যে ডুবুরি জলের তলায় বেশিক্ষণ থাকতে পারে। উবুড় করা পাত্রের মধ্যে অক্সিজেনকে আটক করে। মানুষ এটা আবিষ্কার করেছে কয়েকশ' বছর পূর্বে, কিন্তু জল মাকড়শা সেটা করেছে হাজার বছর আগে। ওরা বুঝে নিয়েছিল জলে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সংসার করতে হলে জলের তলায় বাতাসকে বন্দী করতে হবে। এজন্য ওরা অদ্ভুত একটা কায়দায় অভ্যস্ত হল। পিছনের দুটি পায়ে এবং পেটের খাঁজে বাতাসের একটা বুদ্‌বুদকে আটক করে ওরা জলের কিছুটা নিচে যেতে পারে। বেশি নিচে নয়, কারণ যত নিচে যাবে, জলবুদ্‌বুদের উর্ধ্বচাপও তত বেশি হবে। তাই জলতলের ঠিক নিচেই ওদের বাসা। সেখানেই পদ্মপাতার উল্টো দিকে আঁকড়ে থাকা অতি ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী খেয়ে ওরা বাঁচে। দম ফুরিয়ে গেলে ঐ পেটের খাঁজে আটকানো বুদ্‌বুদ

থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে নিমজ্জমান অবস্থাটা দীর্ঘায়িত করে।

এখানেই ওরা থামল না কিন্তু। বংশরক্ষার বিবর্তন-তাগিদে ওরা আরও একধাপ এগিয়ে গেল। জলের নিচে ওদের বাসায় বাতাস সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করল। ওদের বাসার আকৃতি যেন একটা উবুড় করা খাস-গেলাস। লতা-গুল্মে এমনভাবে আটকানো, যাতে সেটা উল্টে যেতে না পারে। বাপ-মাকড়শা আর মা-মাকড়শা দুজনেই সেই ভালো বাসায় ক্রমাগত সঞ্চয় করতে থাকে—না খাদ্য নয়, বাতাস! বারে বারে উপরিভাগে উঠে যায় আর পেট কোঁচড়ে নিয়ে আসে ছোট্ট একটা বাতাসের বুদ্বুদ! ঐ বাসার ঠিক তলায় এসে বুদ্বুদটাকে ছেড়ে দেয়। সেটা আটক পড়ে খাস-গেলাসের মাথার কাছে, জলের সমতল এক চুল নেমে আসে। এইভাবে ক্রমাগত কয়েক সপ্তাহ হবু বর-বউ তাদের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সটা পরখ করে: ভাঁড়ারে কতটা বাতাস জমেছে। অজাত সন্তানদের পক্ষে সেটা যথেষ্ট মনে হলে তবেই ওরা বাসর শয্যা পাতে। কুমার-কুমারী অবস্থায় এই সঞ্চয়টুকু না সেরে তারা দৈহিক মিলনে সম্মত হয় না। আশ্চর্য সংযম এ-বিষয়ে! হয়তো ঐ যৌথ কাজের আসরেই তাদের বাসরের বীজ বপন করা হয়। অবশেষে বাসার ভিতর মা-মাকড়শা ডিম পাড়ে, তা থেকে বাচ্চা হয়। শিশু-মাকড়শার অক্সিজেনের অভাব হয় না। পিতামাতার সযত্ন সঞ্চিত অক্সিজেনে তারা জীবনের প্রথম পর্যায়টা পাড়ি দেয়—ঠিক যেমন মানুষের বাচ্চা মায়ের বুকের দুধে, বাপের সংগ্রহ করা ল্যাক্টোজেনে ওঁয়া-ওঁয়া থেকে হাঁটি-হাঁটিতে উন্নীত হয়। একটু লায়েক হলেই বাপ-মা দুজনেই একসাথে ধমক লাগায়: বুড়োধাড়ি ছেলে! নিজের বুদ্বুদ নিজে রোজগার করতে পারো না?

তাড়া খেয়ে বাসা ছাড়ে। পড়িতো মরি করে ভেসে ওঠে জলের উপর। তারপর—কে তাকে শেখায় জানি না, ঠ্যাঙ দুটো বাঁকিয়ে, পেট কোঁচড়ে টপ করে পাকড়াও করে ফেলে একটা বায়ু-বুদ্বুদ! টুপ করে ডুব দেয় আবার জলে। বুদ্বুদটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে খাস-গেলাসের তলায়। হাঁক পাড়ে, মা, মা, দেখ কী এনেছি।
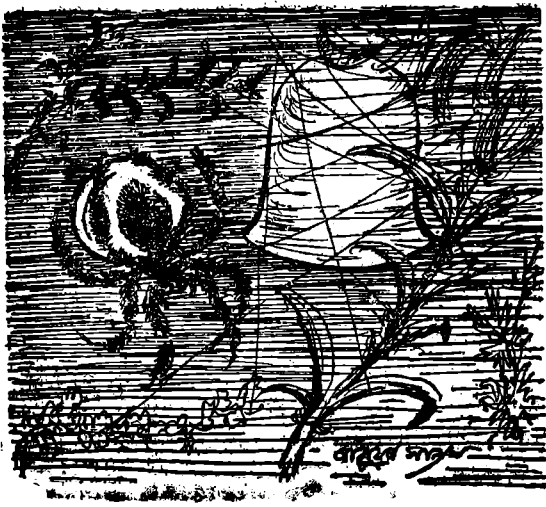
মা বলে, ওমা তাইতো! এযে মস্ত বড় বুদ্বুদ! আমার সোনা ছেলে!

* * * *

এবার ফাইনাল রাউণ্ডের খেলা: ফ্রিজিডেয়ার।

ফ্রিজিডেয়ার কী? এমন একটা যন্ত্র, যাতে খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘসময় সঞ্চয় করে রাখা যায়, পচনকার্য শুরু হতে পারে না। আমরা মাছ মাংস, রান্না তরকারি ফ্রিজে রেখে দিই, সময় ও সুযোগমত তারিয়ে খেতে। অসুবিধা শুধু একটাই—ঠাণ্ডা খাবারটা আবার গরম করে নিতে হয়। না-মানুষেরা আমাদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে। তারা 'ফ্রিজ' করে, কিন্তু খাবারের উত্তাপ সমানই থাকে! অথচ পচনকার্য শুরু হয় না।

এ বিষয়ে আমার সাক্ষী শিকারি বোলতা বা hunting wasp। বংশ-রক্ষার তাগিদে মা-বোলতা মাটি দিয়ে একটা বাসা বানায়। তাতে অনেক-গুলি ছোট-ছোট সুড়ঙ্গ। এক একটির ব্যাস সিগ্রেটের মতো, দৈর্ঘ্যে আধখানা সিগ্রেট। তার ভিতর বোলতা ডিম পাড়ে। কিন্তু বাসার মুখটা বন্ধ করে দেবার আগে তাকে আর একটা কাজ করতে হয়। কারণ ডিম ফুটে সরা-সরি বাচ্চা হয় না, মাঝামাঝি একটা গুটিপোকার দ্বিতীয় অবস্থার মতো জীব ঐ গর্তে চার পাঁচ সপ্তাহ বাস করে। ডিম অবস্থায় প্রাণের খাদ্য বাহির থেকে যোগান দিতে হয় না। আমরা জানি, মুরগির ডিমে লাল-অংশটা

হচ্ছে অজাত শিশু এবং সাদা অংশটা তার খাদ্য। বোতলেরা ডিমটা দুটি অংশ, একটা শিশুর দেহ-প্রাণ, অপরটা তার খাদ্য। কিন্তু ঐ 'লারভা' বা দ্বিতীয় অবস্থায় শিশু খাদ্য পাবে কোথায়? মা সেটা যোগান দেয়। বাসার মুখটা সীল করে দেবার আগে সে মরা মাছি বা মাকড়শা ঐ গর্তে অজাত শিশুদের খাদ্য হিসাবে রেখে দেয়।

কিন্তু তিন-চার সপ্তাহ কোনো মৃত জীবকে ঐ গর্তে রেখে দিলে সেটা নিশ্চিত পচে যাবে। তার অজাত শিশুদল খিদের জ্বালায় সেই পচা মাংস খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বে বা মারা যাবে।

সুতরাং?

জীববিবর্তনের তাগিদে শিকারি বোলতা একটা নতুন আবিষ্কার করল কয়েক হাজার বছর আগে, যা মানুষ করেছে অতি সম্প্রতি: অ্যানাস্থেসিয়া!

শিকারি বোলতা বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে যখন কোনো মাছি বা মাকড়শার উপর পড়ে তখনই তাকে হত্যা করে না। একটি হুল ফুটিয়ে ইনজেকশান দেয়। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! তাতে জীবটা মারা যায় না, শুধু অসাড় হয়ে যায়। মা-বোলতা তখন সেই অচৈতন্য হতভাগ্যকে টানতে টানতে ঐ বাসায় নিয়ে যায়। এভাবে সাত-আটটি অচৈতন্য মাছি বা মাকড়শাকে একের-পর-এক সাজিয়ে রেখে বাসার মুখটা সীল করে দেয়। আশ্চর্যের কথা, দেখা গেছে ঐ অচৈতন্য প্রাণীর সংখ্যা এবং ডিমের পরিমাণ একটি অঙ্কের হিসাবে ছকা—অর্থাৎ অজাত শিশুরা 'লারভা' অবস্থায় যেন খাদ্যাভাবে মারা না পড়ে, আবার অতিভোজনেও যেন পীড়িত না হয়।

জীববিজ্ঞানীরা ঐ বাসা ভেঙে অচৈতন্য প্রাণীগুলিকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। দেখেছেন, সেগুলি মৃত নয়, অথচ জীবনের কোনো বাহ্য চিহ্নও নেই! ইনজেকশান এমন অদ্ভুত যে, তাতে ঐ অচৈতন্য প্রাণীগুলি নিজেরাও

খাদ্যাভাবে মরে যায় না। পুরো সাত-আট সপ্তাহ অর্ধমৃত অবস্থায় অসাড় হয়ে পড়ে থাকে! তারা ঘুমের মধ্যে জানতেও পারে না কখন বোলতা শিশু ডিম ছেড়ে লারভা হল, কখন তারা গুটি গুটি এগিয়ে এল এবং ধীরে-সুস্থে ঐ সারবাঁধা টাটকা জ্যান্ত খাবারগুলি খেতে শুরু করল। মৃত্যু কীভাবে ঘনিয়ে এল তা তারা জানতেও পারল না।

আমার শ্রোতৃবৃন্দ নির্বাক।

আড় চোখে তাকিয়ে দেখি ম্যাক শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার কোনো সাড় নেই। যেন কোনো শিকারি বোলতা তাকে হুল ফুটিয়ে রেখে গেছে। এক জাহাজ মত্ত-লোভীর আক্রমণে তার মৃত্যু কীভাবে ঘনিয়ে আসবে তা যেন সে জানতেও পারবে না।

গল্পটা আমার ঐ খানেই শেষ হবার কথা। কিন্তু সামান্য একটু উপসংহার বাকি আছে:

প্রায় বছর খানেক পরের কথা। আমস্টার্ডামে একটি পার্টিতে একটি ফরাসি মহিলার সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। কথাপ্রসঙ্গে উনি বললেন, অতি সম্প্রতি 'সী কুইন' জাহাজে চেপে তিনি আমস্টার্ডামে এসেছেন। শুনে আমি বললুম, ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন একজন আইরিশম্যান...

ভদ্রমহিলা আমাকে বাধা দিয়ে বলেন, মঁসিয়ে ম্যাকগ্রেগরি তো? চমৎকার মানুষ! দারুণ গপ্পুড়ে। ঠিক আপনার মতো জীবজন্তু নিয়ে মেতে আছেন। অনেকগুলো পোষা জন্তু আছে তাঁর।

আমি তো থ।

উনি বলেই চলেন, একদিন সন্ধ্যায় তিনি আমাদের সবাইকে শুনিয়েছিলেন—জন্তুজানোয়ারেরা কী বুদ্ধিমান! শুনলে আপনি স্তম্ভিত হয়ে যেতেন।

সৌজন্যের খাতিরে আমাকে বলতেই হল, তাই নাকি? ভেরি ইন্টারেস্টিং!

—দারুণ! দারুণ! আপনি তো শুধু চিড়িয়াখানার জন্য জন্তু জানোয়ার ধরে আনেন। কিন্তু কোনোদিন কি ভেবে দেখেছেন, ওদের মধ্যে হয়তো কত পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, দার্শনিক আছেন!

আমি অবাক হয়ে বলি, ম্যাক তাই বললে? কী বলেছিল সে?

—সব কথা আমার ঠিক ঠিক মনে নেই। উনি বলেছিলেন, 'হিপ্পোপম' নামে একজন বাদুড় নাকি জীবজগতের প্রথম 'রেফ্রিজেটার' বানান, একজন শিকারি বোলতা রাডারযন্ত্র আবিষ্কার করেছেন—আরও কী কী সব! মোট কথা ম্যাকগ্রেগরি একজন উঁচুদরের না-মানুষ-দরদী।

—না-মানুষ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ; মনুষ্যেতর, জানোয়ার, অমানুষ ইত্যাদি শব্দ শুঁনিয়ে ম্যাকগ্রেগরি একদম বরদাস্ত করেন না। বলেন, এতে ওঁদের অপমান করা হয়। ঐ-সব না-মানুষ-গ্যালিলেও-নিউটন-আইনস্টাইনদের!*

---

* Gerall Durrell (যাঁর সম্বন্ধে টাইমস্‌ লিটারারি সাপ্লিমেন্ট বলেছিলেন, 'If animals, birds and insects could speak, they would possibly award Mr. G. Durrell one of their first Nobel Prizes') লিখিত 'Encounters with Animals' অবলম্বনে এই বিচারালয়ের দৃশ্যটি পরিকল্পনা করেছি। জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত মূল তথ্য ঐ গ্রন্থ থেকেই সংগৃহীত। কিছু অন্যান্য গ্রন্থ থেকে। □

[পুনর্মুদ্রিত রচনা]

মহাকাশযাত্রী বাঙালী

প্রেমেন্দ্র মিত্র * দিলীপ রায়চৌধুরী * অদ্রীশ বর্ধন

ঘটনার অদ্ভুত যোগাযোগ জীবনে কখনো কখনো আশ্চর্যভাবে দেখা যায়। সকালবেলা কটা বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ডাকে এসেছে। তন্ময় হয়ে তারই কয়েকটা নিবন্ধ ও আলোচনা পড়ছিলাম। মার্কিন একটি পত্রিকায় 'কোয়াসার' সম্বন্ধে অত্যন্ত চমৎকার একটি আলোচনা বেরিয়েছে। সেটি শেষ করে আরো দুটি পত্রিকার কোন নিবন্ধটি আগে পড়ব তাই নিয়ে তখন দ্বিধায় পড়েছি। একটি নিবন্ধ এ্যান্টিম্যাটার সম্বন্ধে। আর দ্বিতীয়টি পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন সংশ্লেষণ প্রকল্প এস-৬ নিয়ে, দুটির আকর্ষণই সমান।

মনঃস্থির করবার আগেই আমার স্নেহাস্পদ দুই সঙ্গী সঞ্জয় ও আকাশ সেন এসে উপস্থিত।

ঠিক এই সময়টিতে এই দুজনের আবির্ভাবও এক হিসেবে ঘটনার যোগাযোগ বটে, কিন্তু আসল যোগাযোগ এটি নয়। যথাসময়ে সে যোগাযোগের কথা বলছি।

টেবিলের ওপর খোলা বৈজ্ঞানিক পত্রিকাটি দেখেই সঞ্জয় বলে উঠল, 'কি পড়ছিলেন কাকাবাবু? 'কোয়াসার' সম্বন্ধে ওই আর্টিকল্‌টাত, সত্যই আজগুবি ব্যাপার।'

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'পড়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ, পড়েই ত আপনার কাছে আসছি, বৈজ্ঞানিকরা ত দেখছি 'কোয়াসার' নিয়ে মহা ফাঁপরে পড়েছেন, তাঁদের এতকালের গড়ে তোলা সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝি আর হালে পানি পায় না। এই সেদিন ভারতীয় একজন বৈজ্ঞানিক 'কোয়া-সার' বা রেডিও গ্যালাক্সি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে আগামী দশ বছরে জ্যোতির্বিজ্ঞান নব নব উত্তেজনার পথে অগ্রসর হতে পারে।'

'কোয়াসার সম্বন্ধে এত উৎসাহ উত্তেজনার আসল কারণটা কি?' জিজ্ঞাসা করল আকাশ।

'এক কথায় এইটুকু মাত্র বলা যায়,' বললে সঞ্জয়,—'যে আধুনিক বিজ্ঞান 'কোয়াসার' রহস্য উদ্ঘাটনে থই পাচ্ছেনা। দৃষ্টি-নির্ভর দূরবীণে যা নেহাৎ-ক্ষীণ নগণ্য তারার কণামাত্র, রেডিও দূরবীণে তারই প্রচণ্ড তরঙ্গ ধরা পরার পর থেকেই বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। গবেষণায় ও সন্ধানে এইটুকু জানা গেছে যে 'কোয়াসার' গুলি আমাদের 'ছায়াপথে'র মতই কয়েকটি বিরাট নক্ষত্রমণ্ডলী। তবে অন্ততঃ চারশো কোটি আলোকবর্ষ তাদের দূরত্ব। শুধু তাই নয়, সে নক্ষত্র মণ্ডলীর তারাগুলিও অসামান্য কিছু, কারণ আমাদের ছায়াপথের মত প্রায় চল্লিশহাজার কোটি তারাময় পঞ্চাশটি নক্ষত্রমণ্ডলীর মত আলোর জোর না হলে কোন 'কোয়াসার'-এর ওই ক্ষীণ দ্যুতিও আমাদের কাছে পৌঁছত না। এছাড়া 'কোয়াসার'-এর প্রধান রহস্যেরও কোনও হদিশ মিলছে না। 'কোয়াসার'- দের আলো মাসে শতকরা দশভাগ বাড়ে কমে দেখা যাচ্ছে। খুব ছোট ঘন গ্যালাক্সিরও ব্যাস অন্ততঃ একহাজার আলোকবর্ষ। বিজ্ঞানের এখনো যা অজ্ঞাত এমন কোন পরমাশ্চর্য প্রাকৃতিক নিয়মের লীলা এর ভেতর না থাকলে হাজার আলোকবর্ষব্যাপী নক্ষত্রমণ্ডলীর এমন মাসিক স্পন্দন সম্ভব হয় না, বলে কেউ কেউ মনে করছেন।'

'এই অদ্ভুত ব্যাপারের সঙ্গে এ্যান্টি-ম্যাটার-এর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে?'—জিজ্ঞাসা করলে আকাশ সেন।

'এ্যান্টিম্যাটার!'—সঞ্জয়ের গলায় একটু যেন কৌতুকের আভাস।

'হ্যাঁ, এ্যান্টিম্যাটার—যাকে বিপরীত বস্তু বলা যায়। আমাদের জানা বিশ্বের পরমাণুর গঠনের ঠিক তা উল্টো। যেমন এ্যান্টিম্যাটারের ইলেকট্রন পজিটিভ আর তার প্রোটন নেগেটিভ।'

'থাক্ থাক্!' সঞ্জয় এবার অধৈর্যের সঙ্গে বললে—'এ্যান্টিম্যাটারের ব্যাখ্যা তোমার কাছে শুনতে চাইনি। আমি বলছি হঠাৎ এ্যান্টিম্যাটারের কথা এসূত্রে তোমার মাথায় এল কি করে? 'কোয়াসার' নিয়ে কেন বিজ্ঞান জগতে এখন এত হৈচৈ তাইত' খানিক আগে জানতে চাইলে?'

'তাত চাইলামই', হেসে বললে আকাশ—'কোয়াসার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতাম না। এ্যান্টিম্যাটার সম্বন্ধেও নয়, তবু জিজ্ঞাসা করছি। 'কোয়াসার' রহস্যের মূলে এ্যান্টিম্যাটার গোছের কিছু কি থাকা সম্ভব?'

'কি সম্ভব, কি অসম্ভব, আমি ত' ছার, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরাও

এখনো বলতে পারছেন না। কিন্তু হঠাৎ এ্যান্টিম্যাটারের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ল কেন? দিব্যদৃষ্টি গোছের কিছু পেয়েছ নাকি?'

'না, দিব্যদৃষ্টি পাইনি,' আকাশ হেসে বললে—'পেয়েছি একটি অদ্ভুত চিঠি গতকাল। তাই পড়েই বলছি। চিঠি না বলে একতাড়া কাগজের প্যাকেটও বলতে পারো।'

আকাশ তার ফোলিও থেকে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলের টিকিট মারা একটি প্যাকেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আবার বললে—'চিঠিটার সবই অদ্ভুত। যে লিখেছে, কলেজে পড়বার সময় তার সঙ্গে একটু পরিচয় হয়েছিল। তারপর আট দশ বছর তার কোন খবর জানি না। পড়াশুনায় খুব ভাল হলেও দারুণ খেয়ালী ছিল। বিজ্ঞানের কি একটা বৃত্তি পেয়ে বিদেশে চলে গেছল এইটুকুই জানি। নামটা একটু অসাধারণ—অত্রি হাজরা।'

'অত্রি হাজরা!'—সঞ্জয়ের গলায় যেন একটু বিস্ময় ও কৌতূহল মেশানো।

'হ্যাঁ, অত্রি হাজরা,' আকাশ বললে—'নামটার চেয়ে অদ্ভুত আজগুবি তার চিঠি। একটু পড়েই দেখুন না।'

তাই দেখতে যাচ্ছি এমন সময় নিচে থেকে আমার লেটারবক্সের কয়েকটা চিঠি টেবিলের ওপর রেখে গেল আমার ভ্রাতা। সেদিকে চেয়ে সঞ্জয়ই প্রথম বললে—'আপনারও ত' বিদেশ থেকে একটা প্যাকেট এসেছে দেখছি। স্ট্যাম্প ত' দেখছি ব্রেজিলেরই।'

'তাই নাকি!'—বলে অবাক হয়ে প্যাকেটটা হাতে নিলাম, আর সেই মুহূর্তে প্রেরকের নামটার ওপরও দৃষ্টি পড়ল। নাম, অত্রি হাজরা।

একেই বলছিলাম ঘটনার অদ্ভুত অবিশ্বাস্য যোগাযোগ। সুদূর ব্রেজিল থেকে একজন বাঙালী যে দুজনকে চিঠি লিখেছে তারা পরস্পরের পরিচিত শুধু নয়, একই সময় একই জায়গায় উপস্থিত হয়ে এবং একই আলোচনায় মত্ত। যা নিয়ে ঘটনার এই যোগাযোগ, সেই চিঠি খুলে এবার একটু পড়লাম। আকাশ ঠিকই বলেছে। চিঠিগুলি সত্যই নামের চেয়ে অদ্ভুত।

আমাকে লেখা চিঠিটা প্রথমে যেন একটু আক্রমণ দিয়ে শুরু। আকাশ ও সঞ্জয়কে তাই পড়ে শোনালাম।

লিখেছে—যা আপনাকে লিখছি তা বিশ্বাস করতে পারবেন না জানি, আপনি কেন, পৃথিবীর জ্ঞানীগুণী বিজ্ঞানবিদেরাও ঐ সব কথা হেসে উড়িয়ে

দেবে নিশ্চয়। কূপমণ্ডুকের বিজ্ঞান নিয়ে এখনো আমরা সন্তুষ্ট। কি করে আমরা বিশ্বাস করবো পৃথিবীর বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অবিশ্বাস্য যুগান্তর ঘটে গেছে। ঘটে গেছে ২৪শে মার্চ ১৯৬১তে। এই তারিখ কারুর কাছে নিশ্চয় স্মরণীয় নয়। মানুষের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে তার পরের দিন ২৫শে মার্চ। প্রথম যেদিন একটি জীবন্ত কুকুর সমেত একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে কক্ষপথে ছোঁড়া হয় রাশিয়া থেকে। কিন্তু একদিন আসবে যেদিন মানুষের মহাশূন্যে বিজয়ের প্রথম স্মরণীয় তারিখ বলে গণ্য হবে ওই ২৪শে মার্চ। কেমন করে এ ব্যাপার সম্ভব হল যদি জানতে চান ভাল করে বোঝাতে পারবো না। ঘোড়ার ডাকে বা পায়রার সাহায্যে যারা সব চেয়ে দ্রুত খবর সেকালে পাঠাত, এখনকার বেতার তরঙ্গে সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে বার্তা প্রেরণের কথা কি তাদের বোঝানো সম্ভব ছিল ?

প্রচণ্ড রেডিও তরঙ্গের উৎসস্বরূপ 'কোয়াসার' নামে সুদূর নক্ষত্রমণ্ডলীর কথা শুনেছেন বোধ হয়, এ্যান্টিম্যাটার কাকে বলে তাও বোধহয় কিছুটা জানেন। 'কোয়াসার'-এর সঙ্গে এ্যান্টিম্যাটারের রহস্যও যে জড়িত থাকতে পারে এই অনুমানের ওপর গবেষণা ও পরীক্ষা করতে গিয়েই আমাদের মহাকাশ যাত্রা ঘটে। কেমন করে ঘটে তা আমি নিজেও এখনও সম্পূর্ণ জানি না, জানবার চেষ্টা করছি মাত্র। না জানবার কারণ পরীক্ষার সাফল্য থেকে নয়, আকস্মিক একটা দুর্ঘটনা থেকেই বিজ্ঞান আগেও অনেকবার নতুন অজানা আবিষ্কার উদ্ভাবনের রাস্তা খুঁজে পেয়েছে।

আমাদের মহাকাশযাত্রার পেছনে বিরাট কোন আয়োজন ছিল না। ছিল না কোটি কোটি টাকার এলাহি কাণ্ড। না কোন আশ্চর্য রকেট সেণ্টার, না লঞ্চিং প্যাড। নেভাডার মরুপ্রায় এক অঞ্চলের একটি নির্জন র‍্যাঞ্চে আমাদের সামান্য গবেষণাগার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গম্বুজের আকারের বিরাট একটি ছিদ্রহীন ধাতুর খোল মনে করুন। তারই মধ্যে বসে আমরা এ্যান্টিম্যাটার সম্বন্ধে নতুন একটি পরীক্ষা চালাচ্ছি। 'কোয়াসার' এর দুর্ভেদ্য রহস্যের কথা ভাবতে গিয়েই ডঃ শ্যাপিরোর মাথায় এ পরীক্ষার কথা এসেছে।

'দাঁড়ান দাঁড়ান'—সঞ্জয় বাধা দিলে। 'ডঃ শ্যাপিরোর নামটা শুনেই এখন মনে পড়ছে। এই অত্রি হাজরাকে ত' আমি চিনি। নামটা শুনে তাই প্রথমে চমক লেগেছিল।'

'তুমিও চেনো!'—একটু অবাক হয়ে বললাম। 'কোথায় তোমার সঙ্গে পরিচয়?'

'আমার পরিচয় হয়েছিল আমেরিকাতে,' বললে সঞ্জয়।

'এ চিঠি কিন্তু লেখা ব্রেজিলের রায়ো-ড্য-জানেরিও থেকে। যা লিখেছে তাতে বিশ্বাস করাই শক্ত, মাথায় একটু ছিট আছে বলেও মনে হয়। আমায় লিখেছে যে এই মূল্যবান বিবরণ পাছে ডাকে খোয়া যায় এই ভয়ে অর্ধেকটা আমায় আর বাকি অর্ধেকটা আরেক-জনকে পাঠাচ্ছে।'

আকাশ সেন বললে—'সেই আরেকজন হলাম আমি। আমাকেও এই কথাই লিখেছে।'

বললাম—'বিবরণটা বিচার করার আগে এই অত্রি হাজরার একটু বিশদ পরিচয় পেলে ভালো হয়। অত্রি হাজরাকে আমেরিকায় কিরকম দেখেছ, তা যদি একটু জানাও সঞ্জয়।

সঞ্জয়ের কথা

আমি তখন কেমিস্ট্রিতে রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়ে আমেরিকায় সান ফ্রানসিস্‌কোর কাছে বার্কলেতে ইউনিভার্সিটি অব্ ক্যালিফোর্ণিয়ায় গেছি। ফাঁক পেলে আশপাশের ইউনিভার্সিটিগুলোতে সেমিনার শুনতে যাই। কাছেই প্যাসাডেনায় ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি। নানা পণ্ডিত লোকে গিজগিজ করছে ওখানে। মাসে দুতিন দিন অদ্ভুত সব নতুন বিষয়ে বক্তৃতা হয়। নোবেল প্রাইজ পাওয়া প্রফেসরদের মুখে বক্তৃতা শোনার এরকম সুযোগ কজনের ভাগ্যে ঘটে।

সেদিন বোধহয় প্রফেসার ম্যালিনোভস্কির বক্তৃতা ছিল। বিষয়: ননইক্যুলিব্রিয়াম থার্মোডাইনামিক্‌স। অসম্ভব ভীড় হয়েছে। অতবড় অডিটোরিয়ামে তিলধারণের জায়গা নেই। বার্কলে থেকে আমরা কজন মোটরগাড়ীতে এসেছি। অফিস-কারখানা ফেরতা ভীড় ঠেলে পৌঁছতে এত দেরী হয়ে গেছে যে একেবারে পেছনের সারিতে বসা ছাড়া আর উপায় নেই।

অদ্ভুত বলতে পারেন প্রফেসর ম্যালিনোভস্কি—তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে প্রায় একঘণ্টা কেটে গেছে। প্রশ্নোত্তরের সময়ই হঠাৎ চমকে সজাগ হলাম। দেখি একটি ভারতীয় ছোকরা মাঝখান থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। সুন্দর ঋজু উন্নত চেহারা, গায়ের রং শ্যামল—যেন বাংলাদেশের মাটির গন্ধ আছে বলে মনে হয়। স্পষ্ট সপ্রতিভ উচ্চারণে জিগ্যেস করলে—'প্রফেসর ম্যালিনোভস্কি, আপনার কি ধারণা আছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনও কোনও

জায়গায় প্রচলিত থার্মোডাইনামিক্সের আইন না'ও খাটতে পারে?'

প্রবীণ অধ্যাপকের প্রশস্ত কপালে তিনটি খাঁজ পড়লো—'হোয়াট ডু ইউ মীন? আমি ত' এমন কোনও নজীর জানি না।'

'আমি জানি'—ছেলেটি দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের সুরে বললে।

'তাই নাকি? সেই স্ট্রেঞ্জ জায়গাটা কোথায়?' এ প্রশ্নের জবাবে ছেলেটি বললে—'এখান থেকে চারশো কোটি আলোক বছর দূরে একটি রেডিও গ্যালাক্সিতে!'

কথাটা এতদূর অবিশ্বাস্য, এত কষ্টকল্পিত যে প্রথমে বিস্ময়ে আবিষ্ট হলেও কয়েক মুহূর্ত পরে একটা বিরাট পরিহাস মনে করে সকলে হাসির অট্টরোলে ফেটে পড়লো।

'হাসবেন না, শুনুন!'—ছেলেটির গলা শুনে সকলে চুপ। সমস্ত অডি-টোরিয়াম নিস্তব্ধ—একটা আলপিন পড়লেও শোনা যায়।

'থার্মোডাইনামিক্সের সেকেণ্ড ল অনুযায়ী এনার্জি উচ্চতর অবস্থা থেকে নীচের দিকে যায়। কিন্তু রেডিও গ্যালাক্সিতে তার ঠিক উলটোটা ঘটছে বলে মনে হয়।'

ওর কথা শুনে সবাই যখন অবিশ্বাসে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে এবং কেউ কেউ ঘাড় ঘুরিয়ে সকৌতুকে ওকে দেখছে, এমন সময়ে সামনের সারি থেকে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। আমার পাশ থেকে বন্ধু ট্র্যাভিস ফিস্‌ফিস্ করে কানে কানে বললে—'উনি প্রফেসর শ্যাপিরো—পালোমার অবজারভেটরীর ভীষণ নামকরা লোক।'

প্রফেসর শ্যাপিরো তখন বলতে শুরু করেছেন—'আমাদের তরুণ বন্ধুটি ঠিকই বলেছেন। মহাকাশে কোনও কোনও গ্যালাক্সিতে আণবিক বিস্ফোরণের পর বিপুলসংখ্যক বস্তুকণা দেখা দেয়। এইসব বস্তুকণার শক্তি জন্মের মুহূর্তে কয়েক মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের কাছাকাছি। প্রফেসর ম্যালিনোভস্কির থার্মোডাইনামিক্স অনুযায়ী ঐসব বস্তুকণার সঙ্গে অন্যান্য বস্তুকণার সঙ্ঘর্ষে তাপ উৎপন্ন হয়ে শক্তি ক্ষয় হয়ে যাবার কথা। অথচ তা না হয়ে কোন এক অমোঘ নিয়মে ওদের শক্তি বাড়তে বাড়তে সহস্র মিলিয়ন ইলেক্ট্রন ভোল্টের কাছাকাছি পৌঁছয়। এর কোনও পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে পারেন?'

প্রফেসর ম্যালিনোভস্কি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর সংক্ষেপে বললেন—'না আমাদের গ্যালাক্সিতে কোথাও এধরনের ঘটনার নজীর নেই।'

বলা বাহুল্য এরপর প্রশ্নোত্তর আর জমলো না। সেমিনার ভাঙতেই করিডরে এই চাঞ্চল্যকর ভারতীয় নায়কটিকে পাকড়াও করলুম।

'আপনি বাঙালী ?'

আমার এই সরাসরি প্রশ্নে ছেলেটি মোটেই চমকালো না। পাল্টা আক্রমণ করলে—'তবে আপনি কি ভেবেছিলেন আমি মেক্সিকান ! খাঁটি কোলকাতার লোক। মেডিক্যাল কলেজের উল্টো দিকে মধুগুপ্ত লেনে আমার বাড়ী।'

ভালই হলো, বাংলা কথা বলবার জন্য আমার পেট ফুলছিল, আলাপটা খুব তাড়াতাড়ি জমে গেল বলতে হবে। ট্র্যাভিসদের বললুম আমাকে প্যাসাডেনায় রেখে বার্কলে ফিরে যেতে। আমি বাসে করে ফিরে যেতে পারবো।

আধঘণ্টা বাদেই বুঝতে পারলুম অডিটোরিয়ামে প্রথম দেখার পর যা মনে হয়েছিল সে ধারণাটা বিন্দুমাত্র ভুল নয়। ছেলেটা একটা জিনিয়াস, কিন্তু বদ্ধ পাগল। বছর তিন-চার হলো ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিট্যুট অব টেকনোলজির মাউন্ট উইলসন ও পালোমার অবজারভেটরীতে গ্রাজুয়েট ছাত্র হিসেবে এসেছে। নাম—অত্রি হাজরা। নামটা বলার পর বুঝতে পারলাম কোলকাতা কাগজে এ'নাম কয়েকবার দেখেছি। অঙ্কে ঈশানস্কলার, তারপর এম, এ,-তেও ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট। একটু সসম্ভ্রমেই প্রশ্ন করলাম—'এখানে আপনার পি, এইচ ডি'র কাজ শেষ হয়ে গেছে তো ?' হো হো করে হেসে উঠলো। সে হাসি আর থামতেই চায় না। হাসির দমকটা থামলে বললে—'এরা বলে কি খালি থিসিস দিলেই চলবে না। পি, এইচ, ডি হতে গেলে লেখা পরীক্ষা পাশ করতে হবে। ভোরবেলায় আটটায় গিয়ে ঐ সব বোরিং মাষ্টারদের পড়া শুনবে কে ? তার ওপর কোনও জন্মেই আমি ভোরে উঠতে পারি না। ফলে ঐ ছাতার পি, এইচ, ডি আমার মাথায় উঠলো না।'

রাত হয়ে যাচ্ছে। রাত্তিরের খাওয়াটা কোথায় খাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে বললুম—'এখানকার ক্যাফেটারিয়া কিরকম ? কিছু খেতে টেতে পাওয়া যাবে এখন ?'

কতকটা বকুনির সুরে বললে—'ঐসব ছাইপাঁশ আমি গিলতে পারি না। আর দ্যাখো বাপু ঐসব মার্কিনী কেতা ছাড়ো। চলো, আমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে ভাত মাছের ঝোল খাবে।'

অ্যাপার্টমেন্টটা অসম্ভব নোংরা ও অগোছালো। মেঝের উপরে ও টেবিলে চারিদিকে রাশিকৃত অঙ্কের বই ও কাগজে কষা আঁকজোক ছড়ানো। এক-দিকে একটা গেলাসে কবেকার একটা শুকনো গোলাপ ফুল। ম্যান্টলপিসের উপর কালীমূর্তির একটা কাঠের ফলক।

খাওয়া দাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে কৌচে এসে আরাম করে বসা গেল। এরকম নির্ভেজাল আড্ডা মারবার সুযোগ কোলকাতা থেকে আসবার পর একদিনও পাওয়া যায়নি।

'আচ্ছা, পি, এইচ, ডি যদি না করো তবে কতদিন থাকবে আর?'

আমার কথা শুনে অত্রি যেন একটু ক্ষেপে গেল—'হু! মনে হচ্ছে তোমাকে কে যেন আমার গার্জেনী করতে পাঠিয়েছে। আমার যতদিন খুশি থাকবো।'

ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম—'আরে না! না! আমি তা বলিনি, মানে তোমার ফিউচার প্ল্যান কি তাই জানতে চাইছি।'

'প্ল্যান, হো হো!'—আবার সেই দিল-খোলা হাসি—'সেদিন পর্যন্ত বিভিন্ন ওয়েভলেংথের ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভের ভেলসিটি মাপছিলাম। তুমি ত' জানো সবাই ধরে নিয়েছে আলোর গতি ও ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভের গতি সমান। কিন্তু অকাট্য প্রমাণ যোগাতে পারেনি কেউ। কষ্ট করে বিভিন্ন তারা থেকে অঙ্ক কষে যখন প্রমাণ করলুম যে বেতার তরঙ্গ ও আলোক তরঙ্গ মূলতঃ একই বেগে চলছে, ততদিনে ছ-মাস কেটে গেছে, আর সবাই আমাকে পাগল ভেবে মুখ টিপে হাসছে।

'জানি তুমি কি ভাবছো। তাতে দুনিয়ার কি লাভ হলো, এই তো? এখানেই তোমাদের গণ্ডগোল। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, রামানুজ—এঁদের ধৈর্য তোমাদের নেই। চাও তাড়াতাড়ি পি, এইচ, ডি হয়ে দেশে ফিরে গিয়ে মোটা মাইনের চাকরীতে বসতে।'

কথায় কথা বেড়ে যায়। কখন যে এইসব অদ্ভুত গল্পের মধ্যে সে রাত পুইয়ে গেছে তা জানতেও পারিনি।

ভোরবেলার বাসে বার্কলে ফিরে এলাম। তারপর সারা সপ্তাহ যেন চুম্বকের মত প্যাসাডেনা আমাকে টানতে লাগলো। শনিবারের আগে আর যাওয়ার সুবিধে হোল না।

দেখি অত্রির অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খোলা। একটি জ্যানিটর ঘরটা সাফ-সুতরো করছে। বই খাতাপত্তর কিছু নেই। আমার একহপ্তা আগে-

কার চেনা মানুষটির কোনও চিহ্ন নেই।

'কি হলো? লোকটি গেল কোথায়?'

জ্যানিটর আমার মুখের দিকে তাকালে, তারপর বললে—'ছাখো বাছা, আমার কাজ ঘর সাফ করা, কোন ভাড়াটে কখন আসছে কখন যাচ্ছে তা খোঁজ রাখা আমার কাজ নয়। যদি তোমার দরকার থাকে ত' ল্যাণ্ডলেডীকে জিগ্যেস করো।'

নীচে নেমে ল্যাণ্ডলেডীর ঘরে নক করলুম।

সাড়া এলো—'ইয়েস, কাম ইন।'

'আচ্ছা, বলতে পারেন, আপনার তেরো নম্বর ঘরের ভাড়াটে মিঃ হাজরা কোথায় গেলেন?'

ভদ্রমহিলা কি একটা ভেবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'কিছু মনে করবেন না, ইউ ইণ্ডিয়ানস আর ভেরী স্ট্রেঞ্জ!' গত পরশুদিন মিঃ হাজরা সন্ধ্যের দিকে আমার হাতে চারমাসের আগাম ভাড়া দিয়ে বললেন—আমি আপনার ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। সেসনের মাঝখানে নতুন ভাড়াটে না পেলেও যাতে আপনার কোনও অসুবিধা না হয় সেই জন্য আগাম ভাড়া রেখে গেলাম। বিদায়, এই বলে ঝড়ের মত উধাও। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, চিঠি রিডাইরেক্ট করার ঠিকানা কি—কিছুই বলে গেল না।'

ওখান থেকে বেরিয়ে আমি অবজারভেটরীতে গেলাম। তারাও কিছুটা হতভম্ব। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, অত্রিও নেই—সেই সঙ্গে প্রফেসার শ্যাপিরোরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা এর পরের বিবরণ আপনাদের চিঠিতে নিশ্চয় কিছু আছে।'

হ্যাঁ, আছে। তবে বেশী কিছু নয়, ডঃ শ্যাপিরোর সঙ্গে যোগ দিয়ে কিভাবে নেভাডার এক নির্জন র‍্যাঞ্চে একটি গোপন পরীক্ষাগার তারা তৈরী করে তারই সামান্য বর্ণনা দিয়ে অত্রি ২৪শে মার্চের সেই বিশেষ ঘটনার কথাই লিখেছে। কোন অজ্ঞাত কারণে তাদের পরীক্ষায় সেদিন অকস্মাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথমে তাদের মনে হয় বুঝি তাদের বিশাল ধাতুর খোলটা কোন বিস্ফোরণে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনির সঙ্গে শরীরের ভেতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় তারা কিছুক্ষণের জন্যে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় কতক্ষণ কাটে তারা জানে না। জ্ঞান হবার পর বিশেষ উপাদানে তৈরী ধাতব খোলের স্বচ্ছ দুটি জানলা খুলে

তারা যা দেখতে পায় তার কোন মানে বুঝতে পারে না। নেভাডার মরু-প্রায় প্রান্তর নয়, তাদের চারিদিকে যেন শূন্য কালো আকাশ, আর সে আকাশে যেন অসংখ্য আলোর বুদ্বুদ ফুটে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। শ্যাপিরোই প্রথম ব্যাপারটা অনুমান করে বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠেন—'একি! দেশ কালের কোনো অজানা রহস্য প্রক্রিয়ায় আমরা যে মহাশূন্যে চলে এসেছি।'

আমাদের পরীক্ষার কোনো ভুলে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তাইতেই কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের এ ধাতব খোল বোধ হয় এ্যান্টিম্যাটারের গুণ পেয়েছে। তাইতেই সম্ভব হয়েছে এ অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

এইভাবে মহাশূন্যে কতক্ষণ তাদের কেটেছে তার হিসেব তারা রাখতে পারে নি। সময়ের হিসেবও বুঝি সে মহাশূন্যে আলাদা। বহুক্ষণ বাদে আলোর বুদ্বুদ ভরা আকাশের চেহারা বদলেছে। ডঃ শ্যাপিরো উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'এবার স্বাভাবিক দেশকালের রাজ্যে ফিরছি। ওই ত' একটা গ্রহের দিকেই যেন আমরা নামছি মনে হচ্ছে।'

তাদের নিঃশ্বাসের হাওয়া তখন ফুরিয়ে এসেছে। সুতরাং এ গ্রহে নিরাপদে নামতে পারলেও পৃথিবীর মত বাতাস পাবে কিনা তাই তখন চিন্তা।

খুব নিরাপদে নামা হয়নি। ধাতব খোলটা বেশ জোরেই আছড়ে পড়ে কিছুটা ভেঙেছে। ডঃ শ্যাপিরো একটু আহত হয়েছেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে এবার অত্রি হাজরা লিখেছে—

* * *

এ কোন্ গ্রহে এলাম আমি?

যে দিকে তাকাই, সেদিকেই দেখি বিস্ময়কর মোটা থামের মত গাছ। বহু উঁচুতে ডাল-লতাপাতার ঘন বুনুনির ফাঁকে ফাঁকে কালো আকাশের বুকে তারার চুমকির মত মধ্যে মধ্যে ঝিকমিক করে উঠছে আলো···এ গ্রহের সূর্যের আলো!

এযে পৃথিবীর মতই। বুক ভরে শ্বাস নিলাম আমি। কই, না তো? কোনো অসুবিধা নেই। পৃথিবীর মতই তেজালো এখানকার বাতাস···তফাৎ শুধু ঝাঁঝালো গন্ধে···

অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। সৌরজগত থেকে এত যোজন পথ পাড়ি দিয়ে যে শেষকালে পৃথিবীর মতই আর একটি গ্রহে পা দিতে পারবো তা কি কল্পনাও করতে পেরেছিলাম?

আকাশযানের পাশেই আহত ডক্টর শ্যাপিরোকে শুইয়ে রেখে পায়ে পায়ে অনেকখানি এগিয়ে এসেছিলাম। নতুন গ্রহ দেখার আনন্দে খেয়াল ছিল না কতদূর এসেছি।

চমক ভাঙলো একটা বিদঘুটে আওয়াজ শুনে। শব্দটা আসছিল পেছন থেকে। ঘুরে দাঁড়িয়েই দারুণ ভয়ে অবশ হয়ে গেল আমার সমস্ত শরীর।

আমি দাঁড়িয়েছিলাম এক ফালি জমির ওপরে। একটু দূরেই কালো পর্দার মত ঘন বন। বহু উঁচু থেকে লতাগুলো নামতে নামতে গাছের গুঁড়ির মতই মাটির ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। এমনি একটা লতা-গুঁড়ির পাশেই দাঁড়িয়েছিল বিচিত্র একটা জানোয়ার।

এরকম সৃষ্টিছাড়া জীব এ গ্রহে দেখতে পাবো, তা ভাবতেই পারিনি। সৃষ্টিকর্তা যেন নিছক রঙ্গ করার জন্যেই হাতি আর গণ্ডারকে একসঙ্গে জুড়ে ছেড়ে দিয়েছেন এ গ্রহের জঙ্গলে। গণ্ডারের মতই তার পেছনের অংশ, তবে বর্মপ্যাটার্নের নয়—মসৃণ। বেঁটে বেঁটে চারটে পা। কিন্তু অদ্ভুত তার মুখটা। গণ্ডারের খড়্গের বদলে সমস্ত নাকটাই গড়ুরের ঠোঁটের মত বেঁকে সরু হয়ে নেমে এসেছে। যেন হাতির শুঁড় যাদুমন্ত্রবলে গুটিয়ে ছোট হয়ে গেছে।

বিদঘুটে আওয়াজটা হাঁসজারু মার্কা এই জন্তুটার গলা থেকেই বেরোচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল হলো, চতুষ্পদ হলেও ভিন্ গ্রহের এই জীবটি মানুষের মত বুদ্ধিমান কিনা, তা যখন জানা নেই, তখন সময় থাকতেই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নেওয়া ভালো।

তক্ষুণি জানোয়ারটার দিকে চোখ রেখে পায়ে পায়ে পিছু হটতে লাগলাম। আরও অস্থির হয়ে উঠলো হাঁসজারু। তারপরই মাথা নীচু করে ধেয়ে এল আমাকে লক্ষ্য করে।

পেছন ফিরেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োলাম। বনের মধ্যে ঢুকেও থামতে সাহস হলো না। কাঁটায় জামাকাপড় ছিঁড়ে, বেশ কয়েকবার ঝোপেঝাড়ে আছাড় খেয়ে শেষপর্যন্ত যুৎসই একটা লতা বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ডালে উঠে পড়ার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ক্ষ্যাপা দানোর মত মাটি কাঁপিয়ে তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল হাঁসজারু। দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল ঝোপঝাড় ভাঙার শব্দ।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ঘেমেনেয়ে গেছিলাম ছুটোছুটির ফলে। নতুন গ্রহে প্রথম জীবটির ব্যবহার দেখে মনটাও খিঁচড়ে গেছিল। নেমে এসে আকাশযানের দিকে যেতে গিয়ে বুঝলাম, সর্বনাশ হয়েছে।

আমি পথ হারিয়েছি। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে গিয়ে খেয়াল নেই কোনদিকে ফেলে এসেছি আমাদের আকাশযান।

কিন্তু ভয়ে দিশেহারা হলে তো চলবে না। আকাশযানে এক্ষুনি আমাকে ফিরতেই হবে। আহত ডক্টর শ্যাপিরো একলা রয়েছেন সেখানে।

কোনদিকে যাই? শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে বনটা একটু ফাঁকা মনে হলো যেদিকে, সেইদিকেই পা বাড়ালাম।

যতই এগোই, ততই বাড়তে থাকে আমার বিস্ময়! নিবিড় অরণ্য, অথচ নিস্তব্দ নয় মোটেই। অজস্র পাখীর ঐকতানে তা মুখরিত। ভগবান এদের সব দিয়েছেন, দেন নি কেবল সুধা-কণ্ঠ। কালো কুৎসিত কোকিলের কণ্ঠে যে মিষ্টতা, টেরোড্যাকটিলের চিৎকারের মত এদের কর্কশ ডাকে তার রেশমাত্র নেই।

আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল বনভূমি। আমিও থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। ব্যাপার কি?

এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে যা দেখলাম, মাথার চুল খাড়া করার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

হাত-পনেরো দূরে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গা। ঠিক মাঝে নিঃসীম আতংকে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে একটা ভারী সুন্দর পাখী···কাঁচের অপলক-মণির মত চক্‌চক্ করছে দুটি চোখ, থিরথির করে কাঁপছে গায়ের পালক··· আর···

আর···একটু দূরেই কিলবিলিয়ে এগিয়ে আসছে একটা লতা!

চলমান লতা! পরক্ষণেই শিউরে উঠলাম আমি। লতা নয়, সাপ! যেমন মোটা, তেমনি লম্বা! ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়েছে শুধু খানিকটা দেহ—সেইটুকুরই দৈর্ঘ্য দেখে বিস্ফারিত হয়ে গেল আমার দুই চক্ষু!

সাপ, না, নতুন কোনো দৈত্য-জীব? সাপ কি এতবড় হয়? এ গ্রহে জীবনের বিবর্তন কি তাহলে হুবহু পৃথিবীর মতই? বয়স উত্তাপ আয়তন আর গড়ন পৃথিবীর মত হলে যে কোনো গ্রহে অবিশ্বাস্য কিম্ভূতকিমাকার জীব নাও থাকতে পারে—জ্যোতির্বিজ্ঞানী হারলো শ্যাপলের এই থিওরী কি সত্য বলেই প্রমাণিত হলো?

আর সময় নষ্ট করা যায় না। অতিকায় সাপ থাকুক তার সুন্দর খাবার নিয়ে, সূর্য হেলে পড়েছে, আলো নেভবার আগেই পৌঁছোতেই হবে আমাকে।

কিন্তু কোথায় আমাদের সেই একমাত্র নিশ্চিত আশ্রয়? হাঁটছি তো হাঁটছিই। পা টন্-টন্ করছে। ক্ষত-বিক্ষত চামড়া জ্বালা করছে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে—কিন্তু বনের শেষ তো নেই? নেই সেই চত্বর যার মাঝে রেখে এসেছি আমাদের আকাশযান?

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটা খস্ খস্ শব্দ আসছে না?

দাঁড়িয়ে যেতেই শব্দটাও থেমে গেছিল। ঝোপঝাড় ঠেলে যাওয়ার শব্দ নয় তো?

পা বাড়ালাম···একটু পরেই আবার সেই শব্দ···খস্···খস্···খস্! কে যেন এগিয়ে চলেছে ঝোপের মধ্যে দিয়ে!

ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। হিংস্র প্রাণী, না ধীমান প্রাণী—এ কার পাল্লায় পড়লাম এবার?

প্রায় একশো ফুট উঁচু একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। সাদাটে গুঁড়ির ছালে অজস্র ফাটল। হাঁচড় পাঁচড় করে এই ফাটলগুলোতে পা রেখেই উঠে পড়লাম সব চাইতে নীচের ডালটাতে।

আশ্চর্য! খস্-খস্ শব্দটা কিন্তু এবার থামেনি। একইভাবে এগিয়ে আসছিল এইদিকে। তারপরেই ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এল একটা অদ্ভুত প্রাণী!

চতুষ্পদ প্রাণী। মধ্যযুগে নাইটরা যে রকম বর্ম পরতো, অনেকটা সেই ধরনের কারুকাজ করা বড় বড় শক্ত হাড়ের খোলা সাজানো সমস্ত শরীরে। ল্যাজেও সারি সারি আংটির মত হাড়ের বর্ম। ছুঁচোলো মুখটা মাটির দিকে নামিয়ে এহেন প্রাণীটাই বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে।

এরপরেই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটলো পরপর কয়েকটি ভয়ংকর ঘটনা।

বর্মপরা প্রাণীটা খুব সম্ভব কৌতূহল বশেই পাছু নিয়েছিল আমার। কিন্তু অকস্মাৎ যেদিকে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই-দিক থেকেই বেরিয়ে এল আর একটা চারপেয়ে জানোয়ার।

পলকের মধ্যেই স্প্রিংয়ের বলের মত লাফিয়ে উঠে শূন্যপথে অতবড় জানোয়ারটা এসে পড়লো বর্মপরা প্রাণীটার ওপর।

পরমুহূর্তেই ঘটলো সেই ম্যাজিক। আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চকিতের মধ্যে বর্মওলা অতবড় প্রাণীটা গোল বলের মত হয়ে গেল। ল্যাজ-মুখ অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে—কঠিন বর্ম-মোড়া অতিকায় একটা বল গড়িয়ে গেল

মাটির ওপর দিয়ে।

নতুন জানোয়ারটার ক্রুদ্ধ গর্জনে থরথর করে কেঁপে উঠল বনভূমি। এতক্ষণে ভাল করে দেখতে পেলাম। জিঘাংসাভরা হাঁড়ির মত মুখ···সর্বাঙ্গে হলদে চামড়ার ওপরে অজস্র কালো ফুটকি।

হুংকার আর আঁচড় কামড়ের পরেও যখন বর্মভেদ করে উঁকি দিল না বেরসিক প্রাণীটা, তখন রাগে গড়্ গড়্ করতে করতে একলাফে একটা গাছের ডালে গিয়ে উঠলো হিংস্র শ্বাপদটা···সেখান থেকে এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল পাতার আড়ালে। আমিও নেমে এসে আবার রওনা হলাম আকাশ-যানের খোঁজে।

কিছুক্ষণ পরেই সূর্য মুখ লুকোলো দিগন্তে। আরও একটু পরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল সন্ধ্যার আঁচল। এখানে-সেখানে উঁকি দিল তারার চুমকি।

শ্বাপদসংকুল এ অরণ্যে আর হাঁটা উচিত নয়। শ্রান্ত অবসন্ন দেহটা কোনমতে টেনে তুললাম একটা গাছের ডালে। ভেবেছিলাম রাতটা সেখানেই কাটাবো ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত—কিন্তু তার আগেই দেখলাম এক অসম্ভব দৃশ্য!

দূরে···অনেকদূরে···গাছপালার ফাঁক দিয়ে আবছা অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম ঢিবির মত উঁচু একটা জমাট অন্ধকার···

একি দেখছি আমি? বিচিত্র গ্রহের নতুন কোনো রহস্য নয় তো?

অত্রি হাজরার বিবরণ এরপর সংক্ষিপ্ত হলেও বিস্ময়কর। দূরের আলো আর ছায়ামূর্তিগুলির সন্ধানে গিয়ে সে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়েছে। অজানা কোন গ্রহের প্রাণী নয়, সেগুলি মানুষ। তারা সেখানে একটি ম্যাঙ্গানীজ খনিতে কাজ করে। খনির ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করে সে জেনেছে যে জায়গাটা ব্রেজিলেরই একটি পার্বত্যবন্য অঞ্চল। ব্রেজিলের টাপির, আর্মাডিলো, অ্যানাকোণ্ডা ও জাগুয়ারকেই সে অজানা গ্রহের প্রাণী মনে করেছে।

সে তখন বুঝেছে যে কোনো অজানা রহস্য প্রক্রিয়ায় তাদের ধাতব আধার মহাশূন্যে পৌঁছে আবার পৃথিবীতেই নেমে এসেছে। অজানা রহস্য প্রক্রিয়া কি হতে পারে ডঃ শ্যাপিরোর সঙ্গে গোপনে সেই গবেষণাই এখন সে করছে লিখেছে।

‘কিন্তু এ কাহিনী কি বিশ্বাস করবার মত?’—জিজ্ঞাসা করলে সঞ্জয়—‘কোয়াসার’ আর এ্যান্টিম্যাটারের কথায় মাথা গুলিয়ে দিয়ে একটা আজ-

শুবি গল্পই আমাদের ওপর চালিয়ে দিয়েছে বলে সন্দেহ হচ্ছে।'

'আমারও তাই, মনে হচ্ছে,'—বললে আকাশ,—'কলেজ জীবনে অত্রি গল্প লিখত এখন মনে পড়ছে। কে জানে সে রোগ হয়ত ওর কাটেনি।'

[আকাশবাণী কলিকাতা থেকে প্রচারিত। ৩রা মার্চ, ১৯৬৫।ঃ সাহিত্য-বাসর।] □
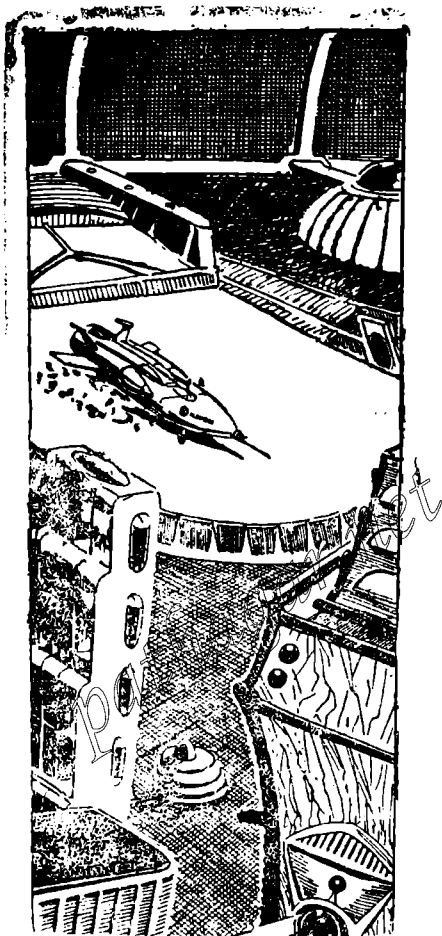
একটা দশ বারো বছরের মেয়ের যতটা দুরন্ত হওয়া সম্ভব তার চেয়েও খানিকটা বেশি দুরন্ত হল টেঁপি। তা সে গেল তার আদরের ছোটমাসির সঙ্গে নারকেলডাঙায় তাঁর শ্বশুর বাড়িতে বড়দিনের সময়। সবাই বারণ করেছিল। সেকেলে বাড়ি, মেয়েরা ভেতরবাড়ি থেকে বেরোয় না, আর কোনো ছেলেমেয়ে নেই। তা কে কার কথা শোনে, উঠল গিয়ে সেখানে ছোটমাসির সঙ্গে। মাসিরা থাকে যাদবপুরে, মাঝে মাঝে নারকেলডাঙায় যায়। টেঁপি এই প্রথম গেল। মাসি অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে সঙ্গে নিল।

অদ্ভুত বাড়ি তাতে সন্দেহ নেই। খুব পুরনো পাড়ার খুব পুরনো বাড়ি, তা দেড়শো বছর তো হবেই, ছোটমেসো বলেছিল। তখন নাকি বাড়ি তৈরী করতে লোহাটোহা লাগত না, খালি ইঁট আর কাঠ আর চুণ সুরকি সিমেন্ট আর কয়েকটা বড় বড় পেরেক। ছাদে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের কড়ি বর্গা। চারদিকে দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল। পাছে শরিকরা ঢুকে পড়ে কোনো অনিষ্ট করে, ছোটমাসি বলেছিল।

টেঁপি তো অবাক। 'তাহলে শরিকরা বোধহয় সায়েব, না ছোটমাসি?'

'দূর বোকা মেয়ে, শরিকরা হল গিয়ে এঁদের সেকালের আত্মীয়স্বজন। তাদের সঙ্গে খুব ঝগড়াঝাঁটি, মামলা-মোকদ্দমার পর বাড়ি জমি সমান দু-ভাগ হয়ে

গেল। মধ্যিখান দিয়ে তিনতলা সমান দেয়াল উঠল। ওদিককার সব জানলা-দরজা বড় বড় পেরেক দিয়ে এঁটে দেওয়া হল। শরিকদের আলাদা গেট হল পেছনের রাস্তা দিয়ে। দুই বাড়িতে ৭৫ বছর দেখাশুনো কথাবার্তা নেই। ওদের নাম এরা কেউ জানে না। ক-জন লোক আছে তারা কি করে, কেমন দেখতে তা পর্যন্ত জানা নেই।'

এ সব পরীদের গল্পের মতো কথা শুনে টেঁপি তাজ্জব বনে গেছিল। এরপর সেখানে না গিয়ে করে কি? পৌঁছল একটা শনিবার সন্ধ্যের আগে, ছোটমেসোর কলেজ ছুটি হবার পরে। গাড়িবারান্দার নিচে মেসোর গাড়িটাকে পিঁপড়ের মতো দেখতে লাগছিল।

দোতলার সমান উঁচু ছাদের, শ্বেত পাথরের মেঝে দেওয়া এই বড় একটা ঘর পার হয়ে, সরু প্যাসেজ দিয়ে ভেতর বাড়িতে যেতে হয়। সেখানে সরু একটা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠল ওরা। একেবারে বিশাল এক রান্না-ঘরের সামনে। দু-বাড়ির মধ্যিখানের তিনতলা সমান দেয়াল বরাবর আমিষ ঘর, ভাঁড়ার ঘর, তারপর নিরামিষ ঘর, তারপর ঠাকুরঘর। পেছন দিকে নিরেট দেয়াল, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। তার পেছনে না জানি কি আছে। মালি তো বলে সেখান থেকে নানা রকম হট্টগোল শোনা যায়, বাজনাবাদ্যি, কেত্তন, হৈ-চৈ। লংকার ধোঁয়া দেয় নাকি ওরা, এদের তাড়াবার জন্য।

আগে শোবার ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে, কাপড় জুতো ছেড়ে, নিরামিষ ঘরে রঙীন মাদুরের ওপর বসল ওরা। বড়-ঠাকুমা ভোগের জন্যে গাওয়া-ঘি দিয়ে সুজি করছিলেন। তাতে পেস্তা বাদাম দেওয়া হয়েছিল। সুগন্ধ ভুরভুর করছিল। সুজিটা একটি রূপোর বাসনে ঢেলে বড়-ঠাকুমা ছোট-ঠাকুমার দিকে ফিরে বললেন, 'এলাচের গুঁড়োটা দে।' ছোট-ঠাকুমা হলেন মেসোর মা। তিনি এতখানি জিব বের করে বললেন, 'কি সর্বনাশ! এলাচের কথা তো মনে ছিল না!' ছোটমাসি উঠতে যাচ্ছিল, 'গুণীকে পাঠাই, ষষ্ঠীচরণের দোকান থেকে এনে দিক?'

বড়-ঠাকুমা বললেন, 'আহা অত ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন? গুণীরা বটতলায় সত্যনারায়ণ দেখতে গেছে। ছোট-বৌ, গোটা চারেক এলাচ ইদিক থেকে চেয়ে নাও না, ল্যাঠা চুকে যায়।'

ছোট-ঠাকুমার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। বললেন, 'টাকা কড়ি দেওয়া হয় না, বাকিতে কারবার। আমার ভালো লাগে না, বড়দি। এক

দিনতো শোধ করতে হবে।'

বড়-ঠাকুমা চটে গেলেন, 'বাজে বকিস্‌নে:। ঠাকুর-সেবার অর্ধেক খরচা তো ওদের দেবার কথা। তা ছাড়া হপ্তায় হপ্তায় হাতে টাকা এলেই তো কিছুটা দিয়ে দিই। ওঠ্ দিকিনি।'

হাঁড়ি-মুখ করে ছোট-ঠাকুমা উঠে পাশের ঘরে গেলেন। মধ্যিখানের দেয়ালটা মাত্র তিন ফুট উঁচু হওয়াতে মাদুরের ওপর বসে বসেই টেঁপি দেখল মস্ত কষ্টি পাথরের ঠাকুর, তার পাশে একটু ছোট মতো পেতলের লক্ষ্মী। তার পেছনে দেয়ালের নক্সা-কাটা সুজনির কোণা সরিয়ে ছোট একটা জানলা খুট করে খুলে, ছোট-ঠামু চাপা গলায় ডাকলেন, 'বগেশ। কয়েকটা ভালো এলাচ দেবে, বাবা?'

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে একটা খচ্ মচ্ শব্দ হল। যেন বাঁশের মই বেয়ে কেউ উঠে আসছে, তারপরেই খোলা জানলায় টিকলো নাক, ন্যাড়া মাথায় টিকি, ফরসা একটা হাসি-হাসি মুখ দেখা গেল।

'ধরেন, ঠাকুমা। বাকির হিসাবে দেবেন, ঠাকুর সেবার জন্যে।' বলেই দুম্ করে জানলাটা বন্ধ করে দিল। একটু খচর-খচর শব্দ হল তারপর সব চুপচাপ। ছোট-ঠাকুমা খুদে হামান দিস্তায় এলাচ কুটতে বসে গেলেন; যেন কিছুই হয়নি।

কাণ্ড দেখে টেঁপি প্রথমটা একেবারে থ! তারপর বলল, 'এই না গাড়িতে আসতে মেসো বলছিল ও-বাড়ির সঙ্গে ৭৫ বছর কোনো সম্পর্ক নেই, নাম জানা দূরে থাক, কে আছে তাও কেউ জানে না!'

বড়-ঠাকুমা কি বিরক্ত! 'ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না, টেঁপি। পুরুষরা জানেই বা কি আর বোঝেই বা কি! সংসার করার হাজার হ্যাপা, তার ঠেলা সামলাতে হয় আমাদের। বগেশ নইলে চলে কখনো? আমার বিয়ের পর থেকে তাই দেখছি। শাশুড়ি সাবধান করে দিয়েছিলেন, খবরদার যেন বাড়ির পুরুষমানুষরা জানতে না পারে। তাহলে সব্বনাশ হবে। সম্পক্ক রাখবে না বললেই হল কি না! ও সব বড় মানুষি করতে গেলে চলে কখনো? শ্বশুরমশাই তাঁর বাবার উইল্ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তা ও ঐ বগেশ-ই না খুঁজে এনে দেছল। বুঝলে নাত্‌বৌ, ছোট খোকার কাছে অবধি মুখ খুলবে না। বলে বাকিতে গোটা পৃথিবী চলছে, আর আমাদের রান্নাঘর চলবে না! তাছাড়া বাকি ও নয় মোটেই, দিই তো কিছু কিছু—আর বগেশ কি টাকাকড়ি ছোঁয় যে তার হাতে দেব?'

এই রকম বকে যাচ্ছেন আর ভোগের জিনিস সুন্দর করে সাজাচ্ছেন বড় ঠাকুমা। ছোট-মাসি খুব রহস্যের বই পড়ে। উঠে গিয়ে কাছে বসে বলল, 'আমি চন্দন বেটে দিই জ্যাঠাইমা। বগেশ যদি টাকাকড়ি না ছোঁয় তো কিছু কিছু শোধ করেন কি করে?'

বড় ঠাকুমা আকাশ থেকে পড়লেন, 'কেন আমার শাশুড়ি যে-ভাবে করতেন, সেই ভাবেই করি। ঠাকুরের পায়ের কাছে, বেদীতে একটা ফুটো আছে। তার মধ্যে দিয়ে ফেলে দিই। নিচে নিশ্চয় বগেশদের জমা নেবার ব্যবস্থা আছে। উঃফ! একেকটা ঘটনা মনে হলে গা শিউরে ওঠে! শ্বশুর-মশাই ফট্‌কা খেলতেন আর হাজার হাজার টাকা লোকশান দিতেন। একদিন ঠাকুরের গয়না চেয়ে বসলেন। তখন ঠাকুরের সিন্দুকে অনেক হীরের গয়না ছিল। শাশুড়ির কাছে চাবি ছিল। সব হীরের গয়না ঐ ছ্যাঁদা দিয়ে ফেলে দেছলেন!' ছোটমাসি বলল, 'অত হাসছেন কেন? হীরে-গুলোকে তো আর বাঁচানো যায়নি, না হয় ফট্‌কা খেলেই যেত।' 'বলিস্ কি রে! ঠাকুরের পায়ের কাছে ফেলে দিয়েছি, ওর চেয়ে বেশী কি বাঁচবে!'

টেঁপি বলল, 'তাহলে ঐ বগেশটা কে, ঠামু? শরিকদের চাকর?' বড়-ঠাকুমা সব গোছগাছ করে উঠে বললেন, 'অতশত বলতে পারব না, বাছা। আমরা সেকেলে মেয়েছেলে, বাইরের লোকে কার কে হয়, তাই দিয়ে আমাদের কি। তুমি বাপু, বড় বেশি কথা বল। আমার শাশুড়ি বলেছিলেন দরকার হলেই বগেশকে ডাকিস্, এবাড়ির পুরুষমানুষরা নিষ্কম্মার ধাড়ি। সেই ইস্তক ওকেই ডেকে আসছি।' ছোটমাসি বলল, 'চোরের গোদা নয় তো? ভুলিয়ে ভালিয়ে সর্বনাশ করবে! ওকে ডাকবেন না।' ছোট ঠাকুমা বললেন, 'না ডেকে কি করি! সেবার বট-ঠাকুরের পেয়ারের কেত্তন গাইয়ের দল এসে রাত দশটা অবধি গাইবার পর, বট-ঠাকুরের খাস্ বেয়ারা নোটো এসে বলল, 'বড়কত্তা বললেন এঁনাদের ভালো করে জলযোগ করিয়ে দাও।' তখন কোথেকে কি করি! সেই সময়ে বগেশই না জানলা দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি লুচি, পায়েস সরের, নাড়ু, মতিচূর, জিবেগজা চালান করে আমাদের মুখ-রক্ষা করেছিল। তোরা ওকেও সন্দেহ করিস্! ছিঃ!'

বলা বাহুল্য, কথাটা ওখানেই চাপা পড়ে গেল।

টেঁপিরা সেবার কিছুদিন নারকেলডাঙায় থেকে গেছিল। এর পরের

সোমবার কোর্ট থেকে ফিরে বড়দাদুর কি ফুর্তি! রান্নাঘরে এসে বড়-ঠাকুমাকে এক গাছা দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, 'রাবড়িটাবড়ি আনাও। শরিকদের ভাগ দেনার দায়ে লাটে উঠছে! আমরা সব কিনে নেব!' বড়-ঠামু বিরস বদনে বললেন, 'টাকার বদলে কি ব্যবহার করবে, দাম দেবার সময়ে?' বড়দাদু তাই শুনে অবাক! 'আমি তো ভাবি তোমার কাছে বাপের বাড়ি থেকে আনা লাখ লাখ টাকা লুকোনো আছে। দরকার হলেই বের করে দাও। সেদিন যেমন দেলে কেত্তন-গাইয়েদের খাওয়াতে।'

বড়-ঠাকুমা টেঁপিকে বললেন, 'যা তো দেখে আয় গে আমার খাটের তলায় সেলাইয়ের চুবড়িতে লালসুতো আছে কি না'—কিছুই না, আসলো ওকে ওখান থেকে সরাবার ইচ্ছা, যাতে বাকি কথাগুলো শুনতে না পায়। টেঁপি সব বোঝে। সুতো নিয়ে ফিরল যখন বড় ঠাকুমা, ছোট-ঠাকুমা, ছোট-মাসি সবাই খুব হাসছেন, বড়-দাদু টাকার ব্যবস্থা করে বোধ হয় চলে গেছেন

ছোট-মাসি বলল, 'তাহলে এ-ও কি বগেশকে বলা হবে?' বড়ঠামু বললেন, 'তা নয় তো কি? আর কে আছে আমাদের? লাটে উঠলে তো সম্পত্তি বাইরের লোকের হাতে চলে যাবে। ওঠ্ ছোট-বৌ তাকে ডাক। এবার ছোট-ঠামু উঠলেন না, তাঁর নাকি অত টাকা চাইতে লজ্জা করে। শেষটা বড় ঠাকুমাই উঠে খুট করে জানলা খুলে ডাকলেন, 'বগেশ।'

সঙ্গে সঙ্গে বগেশের মুখটা দেখা গেল। কেমন যেন হাঁড়ি মুখ, 'বলুন ঠাকুমা।' বড়-ঠাকুমা বললেন, 'শোন বাবা, শরিকের ভাগ খাজনা না দেবার জন্য নিলাম হয়ে যাবে। আর লাখ টাকা হলে বড়-কত্তাই সবটা কিনে নেন। কি করি বল তো?'

বগেশের মুখে হাসি দেখা দিল। 'তাহলে মধ্যিখানের ঐ তিনতলা পাঁচিল ভেঙে ফেলা হবে তো ঠাকুমা?' বড় ঠাকুমা বললেন, 'সে আর বলতে, বাছা, টাকাগুলো যদি পাইয়ে দাও, অল্পে অল্পে ঠাকুরের পায়ে দিয়ে শোধ করব। সব আবার মামলার আগের মতো হবে। এখন কিছু বুদ্ধি দাও।'

বগেশ বলল, 'সে আর এমন কি? এই ঘরের নিচেই আপনাদের গুদাম ঘর। তার চাবি ঐ বড় চাবির গোছাতেই পাবেন। দেখবেন ঠাকুরের বেদীর নিচে খানিকটা বাঁধানো জায়গা। সেইটে ভাঙিয়ে ফেলুন।' এই বলে দুম করে জানলা বন্ধ করে বগেশ নেমে গেল। গিন্নির এ-ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আরো রাত হলে বড়-ঠাকুরদা, ছোট-ঠাকুরদা টেঁপির মেসো, বড় ঠামুর দুই গণ্ডা ছেলে (তাদের ফোন করে নিউ আলিপুর থেকে আনা হল) আরো দু একজন নিজের লোক মিলে গুদোম ঘর খুলে, ভাঙা আসবাব, ফটো বাসন কোষণ, পিলসুজ, পিঁড়ি আর রাশি রাশি আরশুলা ইত্যাদি সরিয়ে দেখেন, তাইতো! খানিকটা উঁচু মতো জায়গা দেখা যাচ্ছে।

সেটার ওপর দু-চার ঘা দিতেই ইঁট আলগা হয়ে একটা চৌবাচ্চা মতো বেরিয়ে পড়ল। চৌবাচ্চাটার তিন ভাগ টাকা কড়ি, সোনার মোহর, হীরের গয়না ইত্যাদিতে ঠাসা। ঠাকুরের বেদীর সেই ছ্যাঁদার নিচে নল বসানো। নলের অন্য মুখ এইখানে।

তারপর আর কি, ঠাকুরের সব গয়না উদ্ধার হল, লাখ টাকার চেয়ে ঢের বেশি পাওয়া গেল। নিলামে শরিকদের ভাগটা কিনে নেওয়া গেল। পাঁচিল ভাঙা হল। ওদিককার সব দরজা জানলার পেরেক তুলতে সাত সাতটা মিস্ত্রি খাটল। হু-হু করে মিষ্টি হাওয়া আর রোদ এসে বাড়িতে ঢুকল।

তারপর বড় দাদু ডেকে বললেন, 'এবার তোমরা মজা দেখ' সে।'

হুদ্দাড় করে সবাই দৌড়ে গিয়ে দেখল, বড়বড় ঘাসে ঢাকা মস্ত মাঠ। তাতে কিছু ফলের গাছ। বাড়ি ঘরের চিহ্নমাত্র নেই। ৭৫ বছর পরে পেছন দিকের রাস্তায় ঠাকুরদারা পা দিলেন। সেখানকার লোকে বলল কোন্-কালে শরিকরা সব মরে ঝরে গেছে, যারা বাকি ছিল তারাও সব ছেড়েছুড়ে বিদেশে চলে গেছে। দেশের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই, তা খাজনা দেবে কে!

টেঁপি তো সর্বদা বেশি কথা বলে, সে জিজ্ঞেস করল, 'তবে যে বললে লংকার ধোঁয়া দিত, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তোমাদের ঘুমের ব্যাঘাত করত? আর বগেশ? সে কোথায় থাকে?'

মেয়েরা সবাই তাজ্জব বনে গেল। এদিকে সব চাঁচাপোঁছা, একটা ইঁট পর্যন্ত বাকি নেই। তাহলে বগেশ কোথায় গেল? মনটা খারাপ হয়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যায় খুট করে জানলা খুলে ঠাকুমারা কত ডাকাডাকি করলেন। কেউ এল না। খালি টেঁপি যেন আবছা দেখতে পেল শাদা ধবধবে ধুতি চাদর গায়ে ন্যাড়া মাথা একটা লোক আমগাছের তলা দিয়ে পেছন দিকের ভাঙা ফটক দিয়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। বগেশ যে আর আসবে না তা আর কাউকে বলে দিতে হল না। □

দেশ ভ্রমণের বাতিক আমার কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা এখন বলা কঠিন, তবে এটুকু বলতে পারি ভারতবর্ষের এমন অনেক জায়গায় আমার যাবার সুযোগ হয়েছে যা সাধারণ ট্যুরিস্টদের হয় না। এর কারণ, বেড়াতে গেলে কোথায় উঠব, কোথায় খাব, ঘুরবার জন্য গাড়ি জুটবে কিনা, দরকারের সময় গাইড মিলবে কিনা এসব নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাই নি। বিলাসবহুল বড় বড় শহর বা ঐতিহাসিক জায়গার চাইতে লোকচক্ষুর আড়ালে প্রকৃতির বুকে যে সব আশ্চর্য সৌন্দর্য এখানে সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তার প্রতিই আমার আকর্ষণটা বেশি। এজন্য এমন অনেক অজ-পাড়াগাঁয়ে অজানা-অচেনা বনজঙ্গলে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি যার নামও কেউ কখনও শোনে নি। আসল কথা, ছুটি পেলেই আমি লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি, সব সময় যে কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থান ঠিক করা থাকে তাও নয়। কিন্তু তাতে আমার ভ্রমণে কোন অসুবিধা হয় না।

এবার কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যাব বলেই বেরিয়েছিলাম। আর, ঠিক একা রওনা হইনি, আমার সঙ্গী ছিল আমার বাল্যবন্ধু কপিল। কপিলই একদিন খবর দিল তার কোন্ এক পিসতুত দাদা মধ্য-প্রদেশের কোন্ এক জঙ্গলে ফরেস্ট অফিসার হয়ে চলে গেছেন। ভদ্রলোক বিয়ে টিয়ে করেন নি, একা একাই থাকেন। মাঝে মাঝে এই নিঃসঙ্গ

জীবন যখন ভালো লাগে না তখন আত্মীয়স্বজনদের কাউকে দিন কয়েক তাঁর ওখানে কাটিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু ঐ বন্য পরিবেশের কথা শুনে কেউ বড় একটা যেতে চায় না। কপিলকেও লিখেছিলেন। সেও একা একা যাবার ভরসা পাচ্ছিল না। হঠাৎ আমার কথা মনে পড়ায় আমার কাছে এসে প্রস্তাব করেছিল, আমি গেলে সেও একবার যেতে পারে।

আমার কাছে বলা বাহুল্য, এ এক অভাবিত প্রস্তাব। কাজেই আমি যে সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যাব এ কথাও বোধ হয় বলার দরকার করে না। কপিলকে বললাম, 'আজই লিখে দে, আমরা যাচ্ছি। মালপত্র সঙ্গে বেশি নেবার দরকার নেই। যত হাল্কা হয় ঘোরার পক্ষে ততই ভালো। পিঠে একটা বড় দেখে ন্যাপ্‌সাক, তার মধ্যেই বাতাস-পোরা বিছানা-বালিশ আর ২-৪-টে জামা কাপড় ভরে নিলেই চলবে। আর হাতে একটা অ্যাটাচি কেসে এটা ওটা দরকারী খুঁটিনাটি জিনিস। ব্যস্‌ এই যথেষ্ট।'

যথা সময়ে আমরা দু'বন্ধু মন্দাবতীর জঙ্গলে এসে হাজির হলাম। যেমনটা ভেবেছিলাম তার চাইতে এটি অনেক দুর্গম জায়গা। দণ্ডকারণ্য পার হয়ে আরও বহুদূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক ফরেস্ট বাংলোয় ডেরা বেঁধেছেন কপিলের দাদা ভগীরথ বাবু। কপিল অবশ্য তাঁকে রাঙাদা বলে ডাকে, আমিও সেই সুবাদে তাঁকে রাঙাদা বলেই বলব। রাঙাদা অবশ্য আমাদের জন্য একটা ট্রাক পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেই ট্রাকে করে শতাধিক কিলোমিটার পথ পার হতে গায়ে দস্তুর মত ব্যথা ধরে গেল। আমার তবু অভ্যাস আছে, কপিল একেবারে যেন নেতিয়ে পড়ল। কিন্তু বাংলোয় পৌঁছে দু'জনেই চমকে উঠলাম।

ভারতের বহু জায়গা ঘুরেছি আমি, প্রকৃতির সমারোহও কম দেখি নি। কিন্তু এ যেন একটা আলাদা জগৎ। পাশ দিয়ে কুলু কুলু করে বয়ে চলেছে একটা পাহাড়ী নদী। এর ই নাম মন্দাবতী, আর এরই নাম থেকে এখানকার অরণ্যের নাম হয়েছে মন্দাবতীর জঙ্গল বা অরণ্য। নদীতে জল বেশি নেই, কিন্তু স্রোত প্রবল। জলের মধ্যে এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে বড় বড় পাথরের চাঁই। নদীর জল তার ওপর আছড়ে পড়ে কোথাও ছড়িয়ে পড়ছে ফোয়ারার মত আবার কোথাও বা সৃষ্টি করছে ছোট ছোট জল প্রপাত। নদীর ওপারেই গহন অরণ্য। বিরাট বিরাট বনস্পতি ঘেঁষাঘেঁষি

করে দাঁড়িয়ে জায়গাটাকে প্রায় দুর্ভেদ্য করে রেখেছে।

রাঙাদা বললেন, 'আগে একটু জলটল খেয়ে জিরিয়ে নাও, তারপর বরঞ্চ একটু বেড়িয়ে আসা যাবে। সঙ্গে থাপাকে নেব, ও বন্দুক নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে যাবে। জাতে নেপালী তো। একসময়ে লড়াইতেও গিয়েছিল। বন্দুক চালাতে ও খুব ওস্তাদ। তবে এখানে ও জিনিসটার বড় একটা দরকার হয় না।'

'কি রকম?'—আমি প্রশ্ন না করে পারলাম না।

রাঙাদা বললেন, 'প্রায় ৮-৯ মাস তো এখানে আছি। কোনদিন কোনও হিংস্র জন্তু চোখে পড়ে নি। কি কারণে ওরা এ জঙ্গল ত্যাগ করেছে ভেবে পাই না। একটু সামনেই দেখবে একটা জায়গায় কেমন খাদের মত একটা গর্ত রয়েছে, যেখানে নদীর জল এসে জমে থাকে চট্‌ করে বেরিয়ে যায় না। এখানকার যত বুনো জানোয়ার, সন্ধ্যা হলেই তারা একে একে ওখানে আসে জল খেতে। নানা জাতের হরিণ, বনগরু, শেয়ালটেয়াল তো আসেই, বানরও কম আসে না। এ জায়গাটায় বানরের খুব আনাগোনা দেখেছি। ছোট-বড় নানা জাতের বাঁদর যাদের সবগুলোর নাম আমি জানি না। কিন্তু রোজই ওরা আসে। হাতিটাতি দূরের কথা, বাঘটাঘ কিংবা ভালুকটালুক থাকলে নিশ্চয়ই তাদেরও দু'-একটার দেখা পাওয়া যেত, আর অন্য জানোয়ার গুলোও সতর্ক হত, কিন্তু সে রকম এখনও দেখিনি। তাই মনে হয় তেমন হিংস্র জন্তু এখানে নেই বললেই চলে। একবার শুধু একটা বুনো শূয়োর দেখেছিলাম। কিন্তু দলে ভারি থাকায় অন্য জানোয়ারগুলো তাকে তেমন তোয়াক্কা করেনি।'

রাঙাদার কথায় ভরসা পেয়ে সেদিনই আমরা তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। অবশ্য থাপা বন্দুক নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছিল। যতই নিরাপদ মনে হোক, জঙ্গল জঙ্গলই। কখন কোন্ দিক্ থেকে বিপদ এসে পড়ে কে বলতে পারে?

কিন্তু দিন কয়েক বেড়িয়েই আমাদের ভয় একদম ভেঙে গেল। শেষে আমি কপিলকে নিয়ে অনেক সময় নিজেরাই বেরিয়ে পড়তাম,—রাঙাদা বা থাপার ভরসায় না থেকে। অত বড় আর এত গহন বন আমি এর আগে আর কখনও দেখি নি। তাই যাবার সময় ভালো করে নিশানা রেখে রেখে চলতে হত পথ হারাবার ভয়ে। রাঙাদা অবশ্য প্রায়ই সাবধান করে দিতেন।

অনেক নতুন নতুন গাছ। সেগুন গাছ খুব বেশি। শাল, শিমূল, শিশু—এসব গাছও কম নয়। তা ছাড়া বিরাট বিরাট ঝুরি নামানো বট, অশ্বথ, পাকুড়—কী নেই? বুনো আম, বুনো জাম, আরও কত নাম-না জানা বুনো দলের গাছও চোখে পড়ত। শুধু তাইই নয়। নানা রকম জীবজন্তুও যখন তখন সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে যেত। বিশেষ করে হরিণ আর বানর।

রাঙাদার কাছে একদিন শুনলাম এহেন গভীর জঙ্গলে এখনও কিছু কিছু জংলী মানুষও নাকি বাস করে। তারা লোকালয়ে বড় একটা আসতে চায় না। দু'একজন নৃতত্ত্ববিদ্ ওদের সম্বন্ধে খোঁজ নেবার চেষ্টা করেন নি এমন নয়। কিন্তু খুব যে বেশি তথ্য যোগাড় করতে পেরেছেন এমন মনে হয় না। তবে এটুকু জানা গেছে যে জংলী হলেও এরা খুব নিরীহ জাতের মানুষ, কিছুটা ভীতুও বলা চলে। চাষবাসেরও ধার ধারে না। বুনো ফলমূল, কন্দ জাতীয় খাবার এখানে অঢেল পাওয়া যায়। তাই খেয়েই এদের দিন চলে। তবে সুযোগ পেলে পাখিটাখি বা হরিণটরিণও যে ধরে খেতে ছাড়ে না এমন নয়।

সেদিন কপিলকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, আর বলতে কি বনের মধ্যে একটু বেশি দূরই ঢুকে পড়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল গাছের এক ডাল থেকে আর এক ডালে একটা অদ্ভুত জন্তু চলে গেল। জন্তুটার মুখ দেখে মানুষ বলেই প্রথমটা মনে হয়েছিল, কিন্তু একটু পরেই দেখলাম পেছনে লম্বা লেজ রয়েছে আর পা দিয়ে গাছের ডাল যে ভাবে আঁকড়ে ধরে চলে গেল তাতে বাঁদর জাতীয় জীব ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না ওকে।

কী হতে পারে জন্তুটা? এর নামও তো কোন দিন শুনি নি!

বাংলোয় ফিরে এসে রাঙাদাকে খবরটা দিতেই তিনি তো হতবাক্। 'বলিস কি রে, এতদিন এখানে আছি, ও রকম কোন জন্তু তো কোন দিন দেখি নি। বলছিস বাঁদরের মত পা, বাঁদরের মত লেজ, কিন্তু মুখটা ঠিক মানুষের মত। এ যে তাজ্জব ব্যাপার। মিসিং লিঙ্ক নাকি?'

এরপর আমাদের ঝোঁক চাপল যে করে হোক জন্তুটাকে খুঁজে বার করতে হবে। জঙ্গলের ভিতর অনেকটা ঢুকতে হবে ঠিকই, কিন্তু আমি তো আগেই বলেছি, যখনই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকি উপযুক্ত নিশানা রেখে যাই—যাতে পথ হারাবার ভয় না থাকে। কাজেই ঐভাবেই আবার সেই জঙ্গলের গভীরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম।

কিন্তু না, গোটা কয়েক বনমোরগ আর হরিণ ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না।

কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। একবার যখন চোখে পড়েছে তখন আর একবার তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। আমার চোখে দৃষ্টি বিভ্রম হলেও কপিলের চোখেও কি তাই হবে? কাজেই যা দেখেছি নিশ্চয়ই ভুল দেখিনি।

পরদিন আবার বেরুলাম। কিন্তু সেদিনও হতাশ হয়ে ফিরতে হল।

এইভাবে পর পর দিন চারেক কাটবার পর কপিল যখন হতাশ হয়ে অনুসন্ধান বন্ধ করবার প্রস্তাব করল, তখন আমার রোখ আরও চেপে গেল। বললাম, 'তুই যাস না যাস, আমি একাই যাব।'

রাঙাদাও সায় দিয়ে বললেন, 'না না, সত্যি যখন ও রকম অদ্ভুত একটা জানোয়ার চোখে পড়েছে বলছ তখন ভালো করে খুঁজে দেখা দরকার বই কি! আজ আমার একটু কাজ আছে, কাল সবাই একসঙ্গে বেরুব। থাপাকেও নিয়ে যাব। একটু সাবধান হওয়া ভালো।

গভীর জঙ্গলে ভেদ করে চলেছি। আগে আগে বন্দুক হাতে থাপা, তার পেছনে আমি আর কপিল, রাঙাদা চলেছেন সবার পিছে। সকলেরই চোখে সতর্ক দৃষ্টি।

দেখতে দেখতে জঙ্গল আরও ঘন হয়ে এল। এবার আর পথ করে যাওয়া সহজ নয়। রাঙাদার হাতে একটা মস্ত ভোজালির মত অস্ত্র। দরকার মত এগিয়ে এসে তিনি গাছের ডাল কেটে কেটে পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। কিন্তু তবু যতই এগোচ্ছি ততই মনে হচ্ছে আর বোধ হয় এগোনো যাবে না। রাঙাদা এখানকার ফরেস্ট অফিসার, তাঁর অন্ততঃ তল্লাটের নাড়ী নক্ষত্র জানা উচিত ছিল। কিন্তু না, তিনিও জানতেন না যে বন এত দূর পর্যন্ত চলে এসেছে আর এত ঘন হয়ে। বনরক্ষীরা কখনও এদিককার কোন হদিস দেয়নি। তারাও হয়তো ভেবেছিল ওদিকে এমন আর কিছু নেই যা সরকারের দিক্ দিয়ে ভালো করে সার্ভে করা দরকার। রাঙাদার আগে তাঁর জায়গায় যিনি ছিলেন তিনি এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এ সব দিকে নজর দেওয়ার চাইতে কোন্ জায়গায় মহুয়া গাছ আছে যা থেকে ভালো মদ পাওয়া যেতে পারে—সেই সব দিকেই নাকি তাঁর উৎসাহ ছিল বেশি।

'এ সব জায়গায় হিংস্র প্রাণী থাকাও অসম্ভব নয়'—আমি মন্তব্য করলাম। রাঙাদা উত্তরে বললেন 'হ্যাঁ, সম্ভব তো সব কিছুই; তবে কথা হচ্ছে হিংস্র প্রাণীদেরও তো প্রয়োজনীয় খাদ্য থাকা দরকার। অর্থাৎ তাদের সঙ্গে কিছু দুর্বলতর প্রাণীও না থাকলে বেচারারা তো না খেয়েই মারা যাবে।'

রাঙাদার কথা শেষ হতে না হতে হঠাৎ কাছের একটা গাছের ওপর থেকে কিচ্ কিচ্ শব্দ শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি চার পাঁচটা বাঁদর অবাক্ চোখে আমাদের দেখছে। বোধ হয় এ রাজ্যে আমাদের মত বিচিত্র প্রাণী ওরা আগে দেখে নি বলেই ওদের ঐ কৌতূহল। কপিলকে একটু ঠেলা দিতেই সে বলল, 'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। ঠিক সেদিনকার মতই লম্বা লেজ, তেমনি পায়ের গড়ন, মুখখানা তো বাঁদরের মতই মনে হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে কোন মিল আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

রাঙাদাও লক্ষ করলেন, 'হ্যাঁ, এ জাতের বাঁদর এখানকার জঙ্গলে মাঝে মাঝে দেখা যায়। খুব বড় বড় চেহারা হয় এদের। ধাড়ি হনুমানের চেয়েও বড়। কিন্তু এগুলি এপ্ নয়, বাঁদরই। কি রকম লম্বা লেজ দেখছ না? এপ্—যাকে তোমরা বল বনমানুষ,—তাদের তো আর লেজ হয় না। অবশ্য উল্লুকের লেজ নেই।'

বলতে বলতে আমরা আর একটু এগিয়ে এসেছিলাম এবার দেখা গেল বানরের সংখ্যা যত কম মনে করেছিলাম ততটা কম না, প্রায় সব ক'টা বড় বড় গাছেই দু-চারটে বসে আছে। আমাদের দেখে কিচ্ কিচ্ শব্দ করে এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে পড়ছিল ওরা। লাফাবার সময় পায়ের আঙুল দিয়ে অনায়াসে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরতেও কোন অসুবিধা হচ্ছিল না ওদের।

'একটা ফটো নেওয়া দরকার।'—বলে রাঙাদা তাঁর ক্যামেরাটা বার করলেন আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনেক দূর থেকে কে যেন ইংরেজীতে চেঁচিয়ে উঠল, 'ডোণ্ট ডিস্টার্ব দেম, ডোণ্ট ডিস্টার্ব।'—ওদের বিরক্ত কর না।

তাজ্জব কাণ্ড! এখানে আবার ইংরেজীতে কথা বলে কে? আর এই সংরক্ষিত বনে রাঙাদার অজ্ঞাতে কোন লোক, শিক্ষিত নিশ্চয়ই, এল কি করে? তবে কি কোন শিকারী লুকিয়ে শিকার করতে এসেছে? শিকারী হলে তার আবার মায়া কেন এত?

নাঃ ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে। থাপা এবার বন্দুক উঁচিয়ে ধরে তাড়া-

তাড়ি শব্দস্থল লক্ষ করে যতটা সম্ভব দ্রুতপায়ে এগোতে লাগল। আমরাও সমান তাল রেখে তাকে অনুসরণ করলাম।

এবারে আবার এক অবাক কাণ্ড। ঘন জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা জায়গা ছোট্ট একটা টিলার মত উঁচু হয়ে আছে। তার আশপাশে কোন জঙ্গল নেই, থাকলেও কেউ তা কেটে পরিষ্কার করে নিয়েছে। সেই টিলার ওপর ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ি, মাথায় ঢালু চাল। দেখলেই বোঝা যায় বুনোদের তৈরি নয়, দস্তুর মত পাকা হাতের তৈরি। ঘরে বাতাস চলাচলের জন্য বড় বড় জানালা বসানো, তাতে কাঠের গরাদে আঁটা। আর, তার চেয়েও আশ্চর্য সেই জানালায় পর্দা ঝুলছে—ফুর ফুর করে উড়ছে হাওয়ায়।

আমরা কাছাকাছি যেতেই দেখলাম ঘরের সামনেকার ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে শার্ট আর ট্রাউজার পরা একটি লোক হাত-পা নেড়ে অনুরূপ পোশাক পরা কয়েকটি লোককে কি যেন বোঝাচ্ছেন। চেহারা দেখে বোঝা গেল এঁরা সকলেই বিদেশী এবং শ্বেতাঙ্গ। অবশ্য কোন দেশের লোক তা গোড়ায় ঠাহর করা গেল না।

এবার থাপাকে পাশে নিয়ে রাঙাদা এগিয়ে গেলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তিনি এখানকার বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্তা, তাঁর অজ্ঞাতে এখানে ঘরবাড়ি তৈরি করে আপনারা কারা এখানে বসতি বসিয়েছেন?

ইতিমধ্যে আমাদের সাড়া পেয়ে ঘরের ভিতর থেকে আরও ২-৩ জন বেরিয়ে এলেন। এঁরা স্ত্রীলোক, এবং পোশাক দেখে মনে হল—এঁরা নার্সের কাজ করেন।

রাঙাদার পরিচয় পেয়ে দলপতি সাহেবটি হ্যাণ্ডশেক্ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। তার পর একটু ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বললেন, 'আমরা বিদেশী,—ইয়োরোপ থেকে বন্য প্রাণী নিয়ে রিসার্চ করবার জন্য এখানে এসেছি। বনবিভাগের সব নিয়মকানুন হয়তো জানি না, তবে আমাদের কাছে ভারত সরকারের অনুমতিপত্র আছে। কোনও বদ্ মৎলব নিয়ে আসি নি।'

রাঙাদা পদোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, 'সে কি! এখানে রিসার্চ করতে এসেছেন, জঙ্গল কেটে ঘরদোর বানিয়েছেন, অথচ সবচেয়ে গোড়ায় যা করা উচিত ছিল—ফরেস্ট অফিসারকে জানানো,—তাই করেন নি! কিসের রিসার্চ করছেন আপনারা? কোথা দিয়ে ঢুকলেন এই ঘন জঙ্গলে?'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে মাথায় ওপর একটা গুরু গুরু আওয়াজ শোনা গেল। সবাই বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল ওপর থেকে একটা হেলি-কপ্‌টার ধীরে ধীরে নেমে আসছে! হেলিকপ্‌টার নামবার জন্য যেটুকু সমতল ভুমি দরকার, ঘরটির পাশে তারও ব্যবস্থা করা রয়েছে!

রাঙাদা ঠোঁট কামড়ে বললেন, 'ও, বুঝেছি। তবে—'

সাহেবও বোধ হয় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, 'বললেন, অন্য কিছু ভাববেন না। উই আর ফ্রেণ্ডস্। লেট্স হ্যাভ এ কাপ্ অভ টি, তারপর আলাপ করব।'

সাহেবের রকমসকম দেখে আমরা তাজ্জব বনে গেছি। একটা অকর্ম যে সে করেছে তাতে ভুল নেই, কিন্তু সেজন্য কোন লজ্জা বা অনুশোচনা হচ্ছে বলে তো মনে হয় না! চালচলন দিব্যি স্বাভাবিক।

বারান্দায় চেয়ার টেবিল পাতাই ছিল, আমরা ইতস্ততঃ করতে করতে যেন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই গিয়ে সেখানে বসে পড়লাম। ভিতর থেকে টুংটাং পেয়ালার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। পরক্ষণেই দরজার ফাঁক দিয়ে কে যেন উঁকি দিল। সাহেব তাকে সরে যেতে ইশারা করলে সে বোধ হয় তা বুঝতে পারল না—আবার এসে উঁকি দিল কৌতূহলের সঙ্গে। এবার আর আমার চিনতে কোন ভুল হল না। সেই লম্বা লোক, সেই লম্বা আঙুলওয়ালা পা আর খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফওয়ালা মানুষের মত মুখ। এ সেই আশ্চর্য জীব, যেটিকে সেদিন আমি আর কপিল অকস্মাৎ গাছের ওপর আবিষ্কার করেছিলাম।

সাহেবের সঙ্গে রাঙাদার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। জানা গেল সাহেবটির নাম ডক্টর ভিলহেল্‌ম স্মিট্, বাড়ি ভিয়েনা। পেশায় ডাক্তার এবং বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক। গ্র্যাফ্‌টিং নিয়ে দীর্ঘদিন রিসার্চ করছিলেন এবং এ ব্যাপারে আশ্চর্য সাফল্যও দেখিয়েছেন। কারও কান বা নাক বা হাত-পা কেটে গেলে অপরের শরীর থেকে তা কেটে নিয়ে বেমালুম যুড়ে দেওয়া তাঁর কাছে কিছুই না। ইদানীং তিনি গ্র্যাফটিং করে এক জানো-য়ারের সঙ্গে অন্য জানোয়ারের আধাআধি যুড়ে দিতেও সক্ষম হয়েছেন। প্রথম প্রথম এক টিকটিকির গায়ে অন্য টিকটিকির কাটা গা যুড়ে কাজ শুরু করেন। তাতে সাফল্য লাভ করার পর আর একটু বড় জানোয়ার নিয়ে পরীক্ষা চালান। এই ভাবে গিনিপিগের সঙ্গে খরগোসের, মেঠো ইঁদুরের

সঙ্গে বেড়ালের, এমন কি কুকুরের সঙ্গে ভেড়ার শরীর যুড়ে দিগে অসাধ্য সাধন করেছেন। অবশ্য ঐসব কাজ সম্পন্ন করতে তাঁকে দীর্ঘ সময় বিচ্ছিন্ন দেহগুলোকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছিল। আর এ কাজ একবারেও সম্ভব হয় নি। প্রতিক্ষেত্রেই বিশ ত্রিশটি করে জীবকে তাঁর এই রিসার্চ-এর জন্য প্রাণ দিতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি খোদার ওপর এই খোদকারিতে সাফল্যই লাভ করেছিলেন।

এর পর তাঁর এক বিচিত্র সাধ হল। এবার পরীক্ষা চালাবেন মানুষের ওপর। মানুষের দেহের সঙ্গে অন্য কোন প্রাণীর, মানুষের সঙ্গে চেহারায় যার খানিকটা মিল আছে এমন কোন প্রাণীর দেহাংশ যোড়া লাগিয়ে নতুন সংকর প্রাণী তৈরি করা যায় কিনা তাই দেখবেন পরখ করে। কিন্তু ইয়োরোপের মত সভ্য দেশে বসে তো আর একাজ চালানো যায় না। কে আসবে তাঁর কাছে এই পরীক্ষার উপাদান হতে? তাই তিনি ঠিক করলেন এমন কোন জায়গায় গিয়ে তাঁর পরীক্ষা চালাবেন যেখানে এমন জংলী মানুষ বাস করে যাকে অন্যেরা মানুষ বলেই মনে করে না। অর্থাৎ যেখানে মানুষের প্রাণের কোনই মূল্য নেই।

কোথায় পাবেন সে রকম জংলী মানুষ? প্রথমেই তাঁর আফ্রিকার কথা মনে হয়েছিল। আফ্রিকার লোকেরা এখন ধীরে ধীরে সভ্য হতে শুরু করলেও এখনও সেখানে বনে জঙ্গলে এমন অনেক মানুষ বাস করে যারা নামেই মানুষ, সভ্য জগতের সঙ্গে এখনও তাঁদের কোন যোগাযোগ ঘটে নি। এই রকম একটা জায়গা হচ্ছে কঙ্গো দেশ। অর্থাৎ কঙ্গোর অরণ্য। প্রথমে সদলবলে সেখানেই চলে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গিয়ে দেখলেন, ব্যাপারটা যত সহজ ভেবেছিলেন ততটা সহজ নয়। ওখানকার জঙ্গলে লোকগুলো অসভ্য হতে পারে, কিন্তু ততোধিক হিংস্র। আশপাশের অন্য প্রাণীরাও। তারপর জায়গাটা এত অস্বাস্থ্যকর যে ঐ আবহাওয়ায় মানুষ হয় নি এমন লোকের পক্ষে ওখানে প্রাণ নিয়ে টিঁকে থাকাই দুষ্কর। তবু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পর পর নিজের বিশ্বস্ত সহকারীদের মধ্যে তিন তিনজনকে খুইয়ে তাঁকে কাজ অসমাপ্ত রেখেই সেখান থেকে পালিয়ে আসতে হয়।

কিন্তু জেদ তাঁর অলঙ্ঘ্য। যা করবেন মনে করেছেন তা করবেনই। খোঁজ খোঁজ করতে করতে শেষে তাঁর এক নৃতত্ত্ববিদ্ বন্ধুর কাছে খবর পেলেন ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে এখনও এমন ২-১টা গহন অরণ্য আছে

যেখানে কোন কোন জাতের জংলী মানুষ সম্পূর্ণ লোক চক্ষুর আড়ালে থেকে শুধু নিজেদের সমাজের গণ্ডীর মধ্যেই বাস করে। শুধু তাই নয়, ঐ অঞ্চলের কাছাকাছি এক রকম বড় জাতের বানরও দেখতে পাওয়া যায় যারা আকৃতিতে বড় হলেও স্বভাবে ভারী নিরীহ। ব্যস, স্মিট সাহেব তাঁর প্রোগ্রাম স্থির করে ফেললেন।

তারপর কি করে ভালোমানুষ সেজে বেড়াবার নাম করে ভারতে এসে শেষে নিজস্ব হেলিকপ্টারে তিনি এই জঙ্গলটি আবিষ্কার করেন এবং সঙ্গী-সাথী এনে সেখানে জঙ্গল সাফ করে কাঠটাঠ কেটে ঘরদোর বানিয়ে, যন্ত্রপাতি বসিয়ে তথাকথিত রিসার্চ এর সাজসরঞ্জাম, মায় অপারেশন থিয়েটার সমেত পুরো একটি গবেষণাগার তৈরি করে ফেললেন, সে এক বিরাট কাহিনী। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ জংলী মানুষদের আস্তানা খুঁজে বার করে, তাদের উপহার-টুপহার দিয়ে প্রলুব্ধ করে কিংবা অন্য কোন উপায়ে পোষ মানিয়ে, তাদেরই একজনের দেহে অস্ত্রোপচার করে তার দেহের নীচের দিক্‌টায় ঐ বড় জাতের বানরের দেহাংশ গ্র্যাফটিং করে যুড়ে দিতে সমর্থ হলেন। অবশ্য এই পরীক্ষার জন্য কতজন জংলী মানুষ আর বানরকে প্রাণ দিতে হয়েছিল তার কোন হিসেব পাওয়া যায়নি, তিনিও বলেন নি। তবে এটা ঠিক, কাজটা করা হয়েছিল গোপনে এবং অনেক দিন ধরে—সম্ভবতঃ রাঙাদা এখানে আসবার বহু আগে। তবে ঐ ভারত সরকারের অনুমতিপত্র টত্র সব বাজে কথা, স্রেফ ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়। রাঙাদা ভালো মানুষ বলে ওগুলো দেখতে চান নি। চাইলে সাহেব খুবই মুশকিলে পড়তেন সন্দেহ নেই।

আমরা সেদিনকার মত ফিরে এলাম। আমার আর বেশিদিন অপেক্ষা করার মত ছুটি ছিল না, কপিলেরও না। রাঙাদা এর পর কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন কিংবা নেবেন বলে ঠিক করেছিলেন তা এখনও জানতে পারি নি। তবে স্মিট সাহেব দুনিয়ার চোখে যত বড় অপরাধই করে থাকুন, তিনি যে সার্জারি ইতিহাসে একটা অকল্পনীয় নজির রেখে গেলেন তা স্বীকার না করে উপায় নেই। এ যেন সুকুমার রায়ের কল্পনার সেই হাঁস আর সজারু মিলে হাঁসজারুর সৃষ্টি। কিংবা, আরও ভালো করে বললে, সেই গাইবাবুর গল্প। গল্পটা যারা শোনে নি তাদের না হয় বলে দিচ্ছি।

একবার এক কেরাণী বাবু আর একটা গরু একসঙ্গে রেল লাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে। সেখানে একজন ওস্তাদ ডাক্তার ছিলেন

যিনি কাটা দেহ জুড়ে দিয়ে লোকদের বাঁচিয়ে দিতে পারতেন। এক্ষেত্রেও ওদের বাঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়িতে একটা ভুল হয়ে গেল—কেরাণী বাবুর ওপরের দিক্‌টার সঙ্গে গরুর নীচে দিকটা যোড়া হল, তেমনি গরুরও নীচের দিকটাও হল কেরাণী বাবুর নীচের দিকটার সঙ্গে যুক্ত। কেরাণী বাবু ঐ নতুন চেহারায় রূপান্তরিত হওয়ায় তাঁর নাম হয়ে গেল, ‘গাই বাবু”। শুধু এখানেই গল্পের শেষ নয়! সেই থেকে কেরাণী বাবু খুর পায়ে খুট খুট করতে করতে রোজ অফিসে যেতেন আর বিকেলে বাড়ী ফিরে দু’সের করে দুধ দিতেন। □

কায়রো থেকে প্রকাশিত : প্রতিটি দৈনিক সংবাদপত্রের শেষ শহর সংস্করণেই খবরটা বেরুলো। কিছু সময়ের মধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে।

খবর যেমন বিস্ময়কর তেমনি ভয়ানক।

আগের দিন গভীর রাতে কায়রো শহর যখন নিঃশব্দ নিথর সুপ্তিতে ডুবে আছে ঠিক এমনই সময় ঘুমন্ত শহরের বুকে ঘটে গেছে এক অভূত-পূর্ব হত্যাকাণ্ড।

অনুমান হত্যাকারীরা সংখ্যায় অগুন্তি। রাতের অন্ধকারে সঠিক ভাবে তাদের চেনা যায় নি। তবে স্বাভাবিক মানুষের মতো যে তারা নয় এ কথা শোনা গেছে। তারা একই সঙ্গে কায়রোর এক ঘন বসতিপূর্ণ এলা-কার বিভিন্ন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে নিদ্রামগ্ন নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিকারে আক্রমণ চালিয়ে তাদের শরীরের সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে গেছে। রক্তহীন ফ্যাকাশে মৃতদেহগুলি ফেলে রেখে সরে পড়ছে নিঃশব্দে।

একটি বারো বছরের বালক ছাড়া এ-ঘটনার অন্য কোন জীবিত প্রত্যক্ষদর্শীও নাকি খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তার মুখ থেকেই শোনা গেছে আক্রমণকারীরা সংখ্যায় অনেক। কোথা থেকে এসেছিল তা সে বলতে পারে নি—তবে মানুষের মতো হাত না থাকলেও তারা যে মানুষ নয়, তা তাদের কুচকুচে কালো শরীর আর পিঠের ওপর একজোড়া বিশাল পাখনা দেখলেই বোঝা যায়।

এমন অদ্ভুত আক্রমণকারীর কথা কেউ কি কখনও শুনেছে?

অনেকেই এ-বর্ণনা ভীত বালকটির ভারসাম্যহীন কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, কিন্তু তাতে সমাধান পাওয়া যায় নি। সব চেয়ে বড় কথা—এমন আক্রমণকারীর হদিশ আজ পর্যন্ত কি পাওয়া গেছে, যারা দলবদ্ধ ভাবে রাতের অন্ধকারের গৃহস্থের ঘরে ঢুকে শুধু বাসিন্দা মানুষ-গুলির শরীরের সমস্ত রক্ত চুষে নিয়ে সরে পড়ে?

সব ব্যাপারটাই কেমন অস্বাভাবিক, গোলমেলে!

এ ঘটনা নিয়ে আলোচনা চললো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মহলে। নানা মত, নানা মন্তব্য শোনা গেল—কিন্তু সঠিক উত্তর কেউ পেল না। তারপর কায়রো নগরীর সেই মৃত দুর্ভাগ্যদের আত্মীয়রা ছাড়া সারা পৃথিবীর মানুষ যথারীতি ভুলে গেল এই আশ্চর্য হত্যাকাণ্ডের কথা। ভোলাটাই বোধ হয় স্বাভাবিক। পৃথিবীতে এখন অনেক সমস্যা—দেশে দেশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা, বর্ণ বৈষম্য, অর্থনৈতিক সংকট।

কিন্তু ঘটনা থেমে থাকলো না।

এবার ঘটনাস্থল কায়রো থেকে অনেক দূরে খোদ নিউইয়র্ক শহর।

উচ্ছল আনন্দে মত্ত রাতের নিউইয়র্ক নগরী তখনও একেবারে ঘুমিয়ে পড়েনি। হঠাৎ শহরের সমস্ত আলোগুলো একসঙ্গে নিভে গেল। চমকে উঠলো সবাই। শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হোল নাকি? এমন তো এদেশে সহজে হয় না। তবে কি কোন গুরুতর কারণ ঘটেছে?

সেই গুরুতর কারণটাই তখন ঘটে চলেছে শহরের অন্য অংশে। অন্ধ-কারের সুযোগ নিয়ে একদল বিচিত্র আক্রমণকারী খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অতর্কিতে পুরো একটা মহল্লায় ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা চিরে নিঃশেষে বার করে নিয়ে গেল সেখানকার তাবৎ প্রাণীর শরীরের রক্ত। তারপর তারা যেমন এসেছিল তেমনিই পালিয়ে গেল কোথাও নিজেদের এতটুকু চিহ্ন-মাত্র না রেখে।

এবারের ঘটনার জীবিত প্রত্যক্ষদর্শী একজন মাতাল। নিগ্রো পল্লী 'ব্ল্যাক টাউন-'এ পেট পুরে সস্তা মদ গিলে রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে পাশের এক নর্দমায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে উত্থানশক্তি হারিয়ে শুয়ে ছিল। পরদিন পুলিশের কাছে আক্রমণকারীদের যে বর্ণনা সে দিয়েছে দিনকয়েক আগে কায়রোতে এ-ধরনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বালকের বর্ণনার সঙ্গে তা মেলে। আক্রমণকারীরা নাকি কিছুটা মানুষের মতো হাত-পা-ওলা হলেও তারা মানুষ নয়। বরং মনুষ্য আকৃতির বাদুড় বলা যেতে পারে। মিশকালো দেহ, বাদুড়ের মতো মুখ। পিঠের ওপর বিরাট দুটো কালো ডানা। ওরা রাতের নিউইয়র্ক শহরের বুকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে কার্যসিদ্ধি করে শূন্যপথেই চলে গেছে।

কিন্তু এমন কথা কি বিশ্বাস যোগ্য? এতো মাতালের প্রলাপ।

তাহলে আসল ব্যাপারটা কি?

আক্রমণকারীদের শারীরিক বর্ণনা যাই হোক, তারা যে গভীর রাতে দলবদ্ধ ভাবে এসে শহরের নিরীহ মানুষগুলোর ওপর রক্তচোষা বাদুড়ের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ে পৈশাচিক ভাবে নিজেদের রক্ত তৃষ্ণা মিটিয়েছে তা তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

এছাড়া আধঘন্টা সময়ের জন্য সারা শহরের বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্নই বা হোল কি করে? তেমনি কোন কারণ তো ঘটে নি।

আক্রমণকারীদের দ্বারাই যদি একাজ সম্ভব হয়ে থাকে তবে স্বীকার করতেই হবে যে রক্তচোষা হলেও তারা অসাধারণ প্রযুক্তি ক্ষমতার অধিকারী।

রহস্য যত জমাট বাঁধতে লাগলো জল্পনা-কল্পনা-ভাবনারাও ততই লাগাম ছাড়া হয়ে ছুটে চললো।

নানা মুনির নানা মত।

অবশেষে এ কথাই বিভিন্ন মহল মোটামুটি মেনে নিল যে এই আশ্চর্য আক্রমণ আসলে কোন বৃহৎ শক্তির কারসাজি। প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের জনবহুল নগরীতে রাতের অন্ধকারে অদ্ভুত কোন কায়দায় অভিযান চালিয়ে (যা শক্তিশালী রাডার যন্ত্রেও ধরা পড়ে না) সেখানকার মানুষের রক্ত শোষণ করে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে নিজেদের রক্তের ভাঁড়ার গড়ে তুলছে তারা। হয়তো এটা সেই বৃহৎ শক্তির ভবিষ্যৎ যুদ্ধে নামার এক অন্যতম প্রস্তুতি। রক্তের ভাঁড়ার সমস্ত দেশেই প্রয়োজন অনুপাতে সীমিত।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার অগ্রণী রাষ্ট্রটি যখন মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েই সমাজতান্ত্রিক বৃহৎ রাষ্ট্রটির দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতে শুরু করেছে, ঠিক এমনই সময় 'নিউইয়র্ক টাইমস' এর একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হোল ভারতীয় বিজ্ঞানী স্যার সত্যপ্রকাশের এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী নিবন্ধ।

স্যার সত্যপ্রকাশের অভিমত : গ্রহান্তর থেকে উড়ে আসা একদল 'বাদুড়-মানুষ' নাকি ঘাঁটি গেড়ে বসেছে আমাদের এই পৃথিবীর কোন অঞ্চলে। বিশ্বের জনবহুল নগরীগুলিতে তারাই নাকি রাতের অন্ধকারে সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালিয়ে রক্ত তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। এই বাদুড়-মানুষেরা শুধু নিশাচরই নয় তারা নাকি ভ্যামপায়ার-এর মতোই রক্ত শোষক—সেই সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তি ক্ষমতার অধিকারী।

প্রথমে ভ্রূকুটি তারপর উপহাস তারপর টিটকিরিতে ফুটিফাটা হোল বিভিন্ন দেশের উন্নাসিকেরা। এমনকি পুঁজিবাদী দুনিয়ার মানুষগুলো স্যার সত্যপ্রকাশের আসল উদ্দেশ্য যে মানুষের সঠিক ভাবনাকে বিপথে চালিয়ে দেয়া এ-মত প্রকাশ করে ওঁকে অন্য শিবিরের দালাল কটুক্তি করতেও ছাড়লো না।

কিন্তু তাদের উপহাস আর গঞ্জনার শব্দ বাতাসে মিশে যাবার আগেই পরবর্তী আক্রমণ ঘটলো সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সর্ব বৃহৎ রাষ্ট্রটির রাজধানীতেই।

গভীর রাতে মস্কো শহরের ঘন বসতি পূর্ণ অঞ্চলে একই ভাবে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চললো। মাত্র আধঘন্টা সময়ের মধ্যেই শরীরের সমস্ত রক্ত হারিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো কয়েকশো নিরীহ মানুষ। এমন কি সে অঞ্চলের মনুষ্যেতর প্রাণীরাও বাদ গেল না।

এরপর মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানেই ঘটে গেল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এর মধ্যে ভারত পাটনা শহরটিও ছিল। তখন সেখানে লোডশেডিং চলছে। প্রত্যক্ষদর্শী যে দু'চারজন বিভিন্ন স্থানে প্রাণে বেঁচেছিল তাদের মুখ থেকে আক্রমণকারীদের যে বর্ণনা পাওয়া গেল—কায়রো শহরের সেই বালক কিংবা নিউইয়র্কের মাতালের দেয়া বর্ণনার সঙ্গে তার কোন অমিল নেই।

প্রাণের দায়ে অবিশ্বাসী উন্নাসিকদের কুঁচকানো নাক এবার সিধে হোল।

বিশ্ব জনমতের চাপে রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ অধিবেশনে বিষয়টা নিয়ে এবার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা চললো এবং অবশেষে এই ভয়াবহ নিশাচর আক্রমণকারীদের বিনাশ করার জন্য একটা পৃথক সেল গঠন করা হোল।

কিন্তু দিন কয়েক তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েও এই আশ্চর্য ক্ষিপ্র এবং সংঘবদ্ধ আক্রমণকারীদের টিকিটিও তারা ছুঁতে পারলো না।। রাতের অন্ধকারে ওরা যেন আসে দুরন্ত ঘূর্ণি ঝড়ের মতো, চলেও যায় তেমনি। পেছনে রেখে যায় শুধু হতভাগ্যদের মৃতের স্তূপ।

অবশেষে প্রাণের দায়ে মান খোয়াতেও রাজী হলেন বিশ্বের বিজ্ঞানী-কুল ও নেতৃবৃন্দ।

'সেল' এর উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত হলেন এক ভেজাল দেশের নির্ভেজাল বিজ্ঞানী স্যার সত্যপ্রকাশ।

স্যার সত্যপ্রকাশ এ খবর যখন শুনলেন তখন রাজস্থানের রতনপুরে তিনি তাঁর নিজস্ব গবেষণাগারে চামচিকে আর বাদুড় নিয়ে কোন গভীর গবেষণায় মগ্ন।

তাঁকে এতবড় একটা সম্মানে ভূষিত করেছেন বিশ্বের সবজান্তা বিজ্ঞানীরা, যাঁরা দিন কয়েক আগেও ব্যঙ্গ আর কটুক্তি বর্ষণ করেছেন—শুনে প্রথমটা অবাকই হয়েছিলেন। তারপর হেসে বলেছিলেন, সমগ্র বিশ্বের এ বিপদে তাঁর পক্ষ থেকে সব রকম সহযোগিতাই তিনি করবেন। এ জন্যে তাঁকে কোন বিশেষ সম্মান-পদ না দিলেও চলবে।

কিন্তু ততদিনে উন্নাসিকদের নাক অনেকটা ঝুলে পড়েছে।

শেষ পর্যন্ত রাজী হতেই হোল বৃদ্ধকে।

তার পরদিন থেকেই কাজে নেমে পড়লেন।

প্রথম কাজ হোল সেই বিচিত্র আক্রমণকারীদের আক্রমণের চরিত্র বিশ্লেষণ করা, সেই সঙ্গে তাদের ঘাঁটিটাকে খুঁজে বার করা।

তার আগে এক আলোচনা চক্রে প্রখ্যাত মার্কিন প্রাণীতত্ত্ববিদ ডক্টর নিকোলাই কেসি স্যার সত্যপ্রকাশকে প্রশ্ন করেছিলেন, আক্রমণকারীরা যে গ্রহান্তরের জীব এবং বাদুড় জাতীয় এক বিশেষ ধরনের মানুষের দল, এ সিদ্ধান্ত তিনি করলেন কি করে?

উত্তরে স্যার সত্যপ্রকাশ তাঁর সঙ্গের ব্যাগের মধ্যে থেকে একটা খাম

বার করতে করতে বললেন—ব্যাপারটা কিছুটা ভাগ্যক্রমেই জানতে পেরেছি। যেদিন রাতে নিউইয়র্ক শহরের ওপর আক্রমণটা ঘটেছিল, তার দিন কয়েক আগে থেকে আমি ওই শহরেই এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বন্ধুর গবেষণা ভবনে আকাশ সম্পর্কে কিছু আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম।

সে রাত্তিরেও দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে তাকিয়ে ছিলাম দূর আকাশে। হঠাৎ নজরটা পড়লো উত্তর আকাশের দিকে। ঝাঁক বেঁধে কি যেন উড়ে আসছে না? প্লেন বা পাখীর ঝাঁক তো মনে হচ্ছে না। দূরবীনের লেন্স এ্যাডজাস্ট করে ফোকাস করতেই পরিষ্কার হোল। লম্বা লম্বা ডানায় ভর করে উড়লেও কোন নিশাচর পাখী ওরা নয়। মুখ আর ডানা বাদুড়ের মতো হলেও চেহারাটা ওদের মানুষেরই মতো। ওরা নেমে আসছে নিউ-ইয়র্ক শহরের ওপর। সেই মুহূর্তে আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব ছিল না, শুধু ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা ভেবে তক্ষুনি কাগজ কলমে চটপট ওই বাদুড়-মানুষদের কয়েকটা স্কেচ করে ফেলেছিলাম। বলতে বলতে খামটা উপস্থিত সদস্যদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন স্যার সত্যপ্রকাশ।

খামের মধ্যে হাতে আঁকা কয়েকটা উড়ন্ত বাদুড়-মানুষের ছবি। এমন প্রাণী সত্যিই পৃথিবীতে কেউ কখনও আগে দেখেনি।

বাদুড়-মানুষের ঘাঁটিটা খুঁজে পাওয়া গেল কিছুটা অভাবিত ভাবেই।

গ্রীনল্যাণ্ডের দেশটা চির বরফ ঢাকা পৃথিবীর উত্তর মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি। এখানে বছরে প্রায় ছ'মাস দিন ছ'মাস রাত।

গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তর অঞ্চলে ওই বরফ রাজ্যে সিনেমার সুটিং তুলতে গিয়েছিলেন হলিউডের একদল সাহসী ছায়া-চিত্র শিল্পী।

ওঁরা যখন ওখানে পৌঁছলেন গ্রীনল্যাণ্ডে দীর্ঘস্থায়ী রাত্তির শুরু হয়ে গেছে। আকাশের বুকে, মেরুজ্যোতির আশ্চর্য রঙের বর্ণালী। এই সুন্দর দৃশ্যাবলী রঙিন ছবির বুকে তুলে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়াই ছিল পরিচালকের মূল উদ্দেশ্য।

স্থানটা মেরু জ্যোৎস্নায় হালকা আলোকিত। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বরফ আর বরফ। মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু বরফের পাহাড়। এ দিকটায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে এস্কিমোরা পর্যন্ত বাস করে না।

পরিচালক নির্দেশ দিলেন খুব কম সময়ের মধ্যে চটপট এখানকার কাজ সেরে চলে যেতে হবে।

সেই মতো শিবির গড়ার ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই লোকেশন রেডি করা

হোল, একটা সায়েন্স ফিকশন থ্রিলার ছবি। পৃথিবীর মহাকাশচারী নায়ক আর নায়িকার এক বরফ গ্রহে অবতরণের দৃশ্য।

নিকটবর্তী তুষার ঢিবিটাতে নায়ক নায়িকা মহাকাশচারীর পোষাকে সেজে উঠে দাঁড়াল। শট্ শুরু হবে মহাকাশচারীদের গ্রহে অবতরণের মুহূর্ত থেকে।

আসল ঘটনা শুরু হোল আরও কিছুটা পর।

ইতিমধ্যে মডেল মহাকাশযানটা একটু দূরেই স্থাপন করা হয়েছে। লাইট, ক্যামেরা, সাউণ্ড-বক্স সব কিছু রেডি। ইউনিটের অন্যান্য অভিনেতা টেকনিসিয়ানরা যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে।

সহকারী পরিচালক শেষবারের মতো নায়ক নায়িকাকে সংলাপ পড়িয়ে এলেন। মেক-আপ-ম্যানও তাঁর তুলির শেষ ছোঁয়াটুকু দিয়ে গেলেন।

ক্যাপষ্টিক পাঠ হোল···লাইট···ষ্টার্ট ক্যামেরা···এ্যাকসান···!

আক্রমণটা ঘটলো ঠিক সেই মুহূর্তে। অত্যন্ত আকস্মিক সেই হিংস্র আক্রমণ।

প্রথমেই যেটা তুষার ঢিবি মনে করা হয়েছিল সেটার এক অংশ সরে গিয়ে এক গহ্বর সৃষ্টি হোল। নায়ক আর নায়িকা দুজনেই হারিয়ে গেল তার মধ্যে। তারপরই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক ঝাঁক আশ্চর্য প্রাণী। তাদের শরীরটা হাত পাওলা মানুষের মতো কিন্তু মুখটা বাদুড়ের মতো। গায়ের রক্ত কুচকুচে কালো। পিঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে একজোড়া বড় ডানা।

ওরা বেরিয়ে এল না বলে উড়ে এল বলাই উচিত। এরাই সেই বিস্ময়কর বাদুড়-মানুষের দল। আর যেটাকে তুষার ঢিবি মনে করা হয়েছিল সেটা আসলে ওদেরই ঘাঁটি। পুরু বরফে ঢাকা থাকায় চেনা যায় নি।

অতর্কিত আক্রমণে একটা প্রাণীকে জীবিত রাখলো না তারা।

ঘটনাটা জানা গেল দুর্ঘটনার দিন কয়েক পর অনুসন্ধানী দল যখন হলিউডের এই সিনেমা কোম্পানীর খোঁজ নিতে নির্দিষ্ট লোকেশনে হাজির হোল।

চির তুষার রাজ্যে কোন কিছুই সহজে নষ্ট হয় না। দেখা গেল পুরো-দলের সারি সারি মৃতদেহ পড়ে আছে—কিন্তু ওদের কারুর শরীরে এক ফোঁটা রক্ত নেই।

ঘটনার বিবরণ পাওয়া গেল আশ্চর্য উপায়ে। আক্রমণটা ঘটেছিল

শুটিং শুরু হবার পর। ক্যামেরা তখন ছবি তুলতে শুরু করে দিয়েছে। সে ক্যামেরা কেউ বন্ধ করে নি। স্বভাবতই সমস্ত হত্যা লীলার দৃশ্যই ক্যামেরা তার ফিল্মের শেষ অংশটুকুতে পর্যন্ত ধরে রেখেছে লেন্সের চোখে দেখে।

এই সেলুলয়েডের রীলটাই হৈ চৈ ফেলে দিল বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে।

বাদুড়-মানুষের অস্তিত্ব এতাদনে প্রমাণিত হল সুনিশ্চিতভাবে।

পৃথিবীর বুকে এমন জীবের অস্তিত্ব যখন সম্ভব নয় তখন ওরা যে গ্রহান্তরের আগন্তুক এ-কথা মানতে চরম অবিশ্বাসীরাও এবার আর আপত্তি করলো না। গ্রহান্তরের ভ্যামপায়ার গোষ্ঠীর এই উন্নত প্রযুক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন হিংস্র প্রাণী-গুলি বর্তমানে ঘাঁটি গেড়েছে দীর্ঘ অন্ধকারের দেশ গ্রীনল্যাণ্ডের চির-তুষার রাজ্যে।

এদের চটপট বিনাশ করতে না পারলে আগামী দিনে সারা পৃথিবীর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

হয়তো আরও ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে সারা পৃথিবীর প্রাণীজগতের রক্ত চুষে শ্মশান করে দেবে এই ধরিত্রী।

অতএব কালবিলম্ব না করে অভিযান শুরু হোল তুষার রাজ্য গ্রীনল্যাণ্ডে।

কিন্তু যতটা সহজ ভাবা হয়েছিল দেখা গেল কাজ মোটেই তত সহজ নয়।

এক আশ্চর্য শক্তিশালী চুম্বক বেষ্টনীতে ওরা ঘিরে রেখেছে সারা মহাকাশযান।

হ্যাঁ, ঘাঁটিটা আসলে ওদের মহাকাশযান—যার সাহায্যে গ্রহান্তর থেকে ওরা উড়ে এসেছে এই পৃথিবীর বুকে।

রাষ্ট্র সংঘবাহিনীর কিছু কিছু অধৈর্য রণনায়কের কাছ থেকে প্রস্তাব এল নিউক্লিয়ার মিশাইল প্রয়োগ করা হোক বাদুড়-মানুষদের তুষার ঘাঁটির ওপর।

বাধা দিলেন স্যার সত্যপ্রকাশ। তাঁর মতে, ও এলাকার যুগ-যুগান্তর ধরে জমে থাকা বরফ প্রচণ্ড উত্তাপ সঞ্চারে গলতে শুরু করলে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে পৃথিবীর বুকে। ভাসমান হিমশৈলী, জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন ছাড়াও সমুদ্র জলের উচ্চতার কিছুমাত্র হেরফের হলেও সমুদ্র নিকটবর্তী অনেক ভূখণ্ডই চলে যাবে সাগর গর্ভে।

একবাক্যে এ কথা মেনে নিলেন বিশ্বের সমুদ্র বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু তাহলে ওই ভয়ঙ্কর বাদুড়-মানুষদের হাত থেকে বাঁচবার উপায়ই বাকি ?

উপায় বার করলেন স্যার সত্যপ্রকাশই।

যে পদ্ধতিতে তিনি গ্রহান্তরের উন্নত কারিগরী ক্ষমতা সম্পন্ন ওই সব পিশাচ বাদুড়-মানুষদের পৃথিবী ছাড়া করলেন তা এক কথায় অভূতপূর্ব।

বাদুড়-মানুষদের একমাত্র দুর্বল ক্ষেত্রটিতেই আঘাত হানলেন তিনি।

বাদুড়-মানুষেরা নিশাচর। দিনের আলোয় তারা সম্পূর্ণ অসহায়। পৃথিবীর বাদুড় জাতীয় প্রাণীকুলের মতো তারাও আলোকে ভয় পায়। এবং রাতের পৃথিবীতে উড়ে বেড়ায় নিজেদের ডানায় উৎপন্ন এক ধরনের কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দের প্রতিঘাত অনুসরণ করে।

ওদের এই বিশেষ দুর্বলতাটুকু ধরে ফেলেছিলেন স্যার সত্যপ্রকাশ।

এবং তারপরই উত্তরমেরু অঞ্চলে গ্রীনল্যাণ্ডের দীর্ঘ রাতের আকাশে তুলে দিলেন এক কৃত্রিম ক্ষুদে সূর্য।

মানুষের দ্বারা কি ভাবে এই কৃত্রিম ক্ষুদে সূর্য সৃষ্টি সম্ভব সে জটিল বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে আপাততঃ শুধু এটুকুই বলা যায় যে আজকের উন্নত দেশের বিজ্ঞানীকুল আলো এবং শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য ইতিমধ্যেই দেশে দেশে কৃত্রিম সূর্য গঠনে তৎপর হয়ে পড়েছেন। পরিকল্পনা করছেন নিয়ন্ত্রিত সংযোজন চুল্লীতে অত্যন্ত উষ্ণ প্লাজমা মাধ্যমে নিউক্লিয় সংযোজন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন করে দ্বিতীয় ক্ষুদে সূর্য বানাবার।

স্যার সত্যপ্রকাশ এই পরিকল্পনা মাফিকই অত্যন্ত দ্রুত প্লাজমার মধ্যে নিউক্লিয় সংযোজন পদ্ধতিতে এক অভিনব সূর্য সৃষ্টি করে স্থাপিত করলেন তুষার ভূমির অন্ধকার আকাশে।

দূরীভূত হলো উত্তর মেরুর অন্ধ অমানিশা।

আলোয় ঝলমল করে উঠলো গ্রীনল্যাণ্ডের প্রকৃতি। এই অকাল সূর্যোদয়ের দৃশ্যে অবাক হয়ে ইগলু বাসভূমি থেকে বেরিয়ে এল দক্ষিণ গ্রীনল্যাণ্ডের বাসিন্দা এস্কিমোরা। অকাল বসন্তের ছোঁয়া লাগলো তুষার রাজ্যে।

কিন্তু সর্বেফুল দেখলো গ্রহান্তরের সেই বাদুড়-মানুষের দল। বাইরের আলোর রাজ্যে তাদের বেরুবার উপায় নেই। মহাকাশযানে শুধু বন্দী হয়ে থাকা।

এভাবে চললো দিনের পর দিন। ইতিমধ্যে আকাশযান ঘাঁটিতে

বাদুড়-মানুষদের খাদ্য ভাণ্ডার শূন্য। শুরু হয়ে গেছে অনাহার। রক্ত চাই—তাজা রক্ত। এছাড়া অন্য কিছুতে খিদে তেষ্টা মেটে না ওদের। কিন্তু মাথার ওপর ওই কৃত্রিম সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল প্রকৃতিতে কি করেই বা ঝাঁক বেঁধে বেরুবে ওরা রক্ত-আহার অন্বেষণে?

তার মানে যতটা বোকা নিরীহ ভাবা গিয়েছিল এ গ্রহের মানুষগুলোকে তা তারা নয়। রীতিমত বিপজ্জনক এবং ফাঁদে ফেলতে ওস্তাদ।

কৃত্রিম ক্ষুদে সূর্য গ্রীনল্যাণ্ডের মাথায় স্থাপন করার ঠিক একুশদিনের দিন একটা কালো গোলাকৃতি আকাশযান গ্রীনল্যাণ্ড-এর তুষার ভূমির ভেতর থেকে মাথা তুলে ক্ষিপ্রগতিতে উড়ে মিলিয়ে গেল অসীম আকাশে।

রাষ্ট্রসংঘ সমেত সমস্ত উন্নত দেশের নিজস্ব টি ভি পর্দায় এ দৃশ্য যখন ভেসে উঠলো—আনন্দে যে যার আসনে লাফিয়ে উঠলেন বিশ্বের বিজ্ঞানীরা।

পৃথিবী রক্ষা পেয়ে গেছে!

এরপর এ কাহিনীর আর লেখার কিছু থাকে না। তবে শোনা গেছে রাষ্ট্রসংঘ বিজ্ঞান পরিষদ নাকি স্যার সত্যপ্রকাশকে তাঁর এই বিরাট কৃতিত্বের জন্য বিশ্ববাসীর পক্ষ থেকে বিপুল ভাবে সম্মানিত করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা নাকি তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে শুধু একটা আবেদনই রেখেছেন—রাষ্ট্রসংঘের আর্থিক সহযোগিতায় যে কৃত্রিম ক্ষুদে সূর্যটা স্যার সত্যপ্রকাশ তৈরী করেছেন তা যদি তাঁকে নিজের দেশ ভারতের কল্যাণে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয় তাহলেই তিনি সব থেকে বেশী কৃতার্থ বোধ করবেন। কারণ আমাদের এই হতভাগ্য গরীব দেশের ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা মেটাতে এমন একটি কৃত্রিম ক্ষুদে সূর্য তৈরীর আর্থিক সংগতি আজও আমাদের হয় নি।

স্যার সত্যপ্রকাশের এ আবেদনে রাষ্ট্রসংঘ সাড়া দেবেন কিনা জানি না—কিন্তু কথাটা শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছে এই ভেজাল দেশের নির্ভেজাল বিজ্ঞানীটির সত্যিই জুড়ি নেই!! □
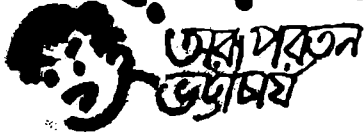
সার্জেন ভাদুড়ি বললেন, ইমিডিয়েটলি অপারেশন করা দরকার। মাথায় চোট লেগেছে, কনডিশন ক্রিটিক্যাল। বাঁচবে কি না বলা যায় না।

তারপর ইতস্তত করে বললেন, তোমরা কি একে চেনো ?

না, এ আমাদের পাড়ার ছেলে নয়। ছেলেরা জবাব দিল। একে আমরা চিনি না।

আমরা নন্দদের বাড়ির পেছনের বাগানে খেলছিলাম। এমন সময়ে সামনের রাস্তায় হৈ হৈ শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে দেখি, সাংঘাতিক অবস্থা। ছেলেটাকে ধাক্কা মেরে একটা লরি পালিয়ে যাচ্ছে। পেছনে ধরবার জন্যে সবাই দৌড়োচ্ছে। আমরাও দৌড়োলাম। কিন্তু লরিটাকে কি ধরা যায় ? লরিটা পেট্রোল পাম্পের পাশের রাস্তায় পড়ে চোখের নিমেষে বেরিয়ে গেল।

তারপর আমরা সবাই ধরাধরি করে ছেলেটাকে আপনার এখানে নিয়ে আসছি। ছেলেটা এ পাড়ায় থাকে না। ট্রাম লাইনের ওপারেও অনেককে চিনি। ও ও-পাড়ার ছেলে বলেও মনে হচ্ছে না।

সার্জেন ভাদুড়ি ছেলেটাকে আর একবার লক্ষ্য করলেন। অভিজ্ঞ সার্জেনের প্রত্যয় তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠল।

নার্স মিস সেনকে ডেকে বললেন, এখুনি ওকে ওটিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কর। ডঃ মুখার্জি আর ডঃ বটব্যালকে খবর দাও। ডঃ সিনহা বোধ হয় এখন এখানেই আছেন। ভালই হল। তাঁকে বল, তিনি যেন কোথাও বেরিয়ে না যান।

তারপর ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা ওর বাড়ির খোঁজ কর।

পুলিশে একটা খবর দিয়ে রাখো। পকেটে কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর তো কিছুই দেখছি না। বোধ হয়, বেশি দূরের ছেলে হবে না।

কিন্তু আমি আর তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। ইনটারন্যাল হেমারেজ হয়েছে কি না। লরিটা নিশ্চয় পেছনের থেকে ধাক্কা মেরেছে। কংক্রিটের রাস্তা। প্রথম চোটটাই লেগেছে সম্ভবত ছেলেটার মাথার উপরে।

তারপর আপন মনেই বললেন, আজকাল লরি-টরিগুলো এমন ভাবে চালায়।

সার্জেন ভাদুড়ি নার্সিং হোমের অন্দরের পর্দা সরিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হলেন।

ওটিতে ক্ষিপ্রহস্তে সার্জেন ভাদুড়ি নিজেকে তৈরি করে নিয়ে আর একবার ছেলেটিকে লক্ষ্য করলেন।

মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে, বয়সে পনেরো ষোলোর বেশি নয়। নাকের নীচে আর থুতনিতে দাড়ি গোঁফের ঈষৎ আভাস। কপালে একটা কাটা দাগও আছে।

সার্জেন ভাদুড়ি আর কোনোদিকে না তাকিয়ে স্কাল ওপেন করলেন।

মারাত্মক অবস্থা।

সেরিব্রামের ভাঁজগুলি লরির ধাক্কায় একেবার অবিন্যস্ত হয়ে গেছে। একে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়। তবু এখনও হয়তো ছেলেটিকে বাঁচানো যেতে পারে। কিন্তু যদি বা বেঁচে যায়, বুদ্ধিবৃত্তি আগের মত স্বাভাবিক থাকবে কি না বলা কঠিন। হয়তো বা সে একটা জড়পিণ্ডে পরিণত হবে।

বাড়ির লোকে কি তা চাইবেন? দেখা, শোনা, স্পর্শের মত অনুভূতি—সব কিছুই নির্ভর করছে সেরিব্রামের স্বাভাবিকতার উপরে।

সার্জেন ভাদুড়ি অস্থির হয়ে উঠলেন।

কি করা যায়?

ছেলেটির বাবা-মার সঙ্গে একবার কথা বলে নিতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু সে সম্ভাবনা এখনই আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

এক কাজ করা চলে। তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণাকে তিনি এই মুহূর্তে কাজে লাগাতে পারেন। তত্ত্বগত দিক দিয়ে তাঁর পেপার সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মানুষের মস্তিষ্কের উপরে অস্ত্রোপচার এবং তার ফলে স্মৃতিকে লোকান্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

বিষয়টি যে সবাইকে আকর্ষণ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মানু-

ষের মস্তিষ্কের ভেতরে সেরিব্রাম এবং সেরিবেলাম নামে প্রধানত যে দুটি অংশ আছে, সার্জেন ভাদুড়ি কাজ করেছেন তার মধ্যে সেরিব্রাম অংশটি নিয়ে। সেরিব্রাম মস্তিষ্কের উপরের অংশ। তার বিভিন্ন কাজ নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন অংশ।

একটি মানুষের মস্তিষ্ক অসংখ্য স্নায়ুকোষের সমষ্টি যাকে বলা হয় নিউরন। এই নিউরন সংখ্যায় প্রায় হাজার কোটি হবে। এগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। তা-ছাড়া মানব দেহের মধ্যে স্নায়ুর যে জাল বিছোনো রয়েছে সেগুলির সঙ্গেও এরা যুক্ত তো বটেই।

সার্জেন ভাদুড়ির কৃতিত্ব, তিনি এই জটিল মানব মস্তিষ্কের বিন্যাসকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কালের ব্যাপ্তিতে এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে মস্তিষ্কের কোটরে কোটরে স্মৃতি সঞ্চারিত হয়।

ইতিহাস বিচার করলে এ রকম কথা কেউ কেউ বললেও বলে থাকতে পারেন। কিন্তু সার্জেন ভাদুড়ি আসলে যে কথা বলতে যাচ্ছেন, তা হলো এই যে, মানব মস্তিষ্কের সেরিব্রামের উপরে অস্ত্রোপচার করে তাকে লোকান্তরের স্মৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

বিষয়টি অভিনব। বিজ্ঞানী সমাজে সবাই যে তাঁর বক্তব্যকে মেনে নিয়েছেন তা নয়। কেউ কেউ এমন বক্তব্যকে নিছক পাগলামি বলেও উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ড. ভাদুড়ির দৃঢ় বিশ্বাস, দেশে বিদেশে একদিন তাঁর বক্তব্যের যাথার্থ্য নিশ্চয়ই স্বীকৃত হবে।

সার্জেন ভাদুড়ি তাঁর বক্তব্যকে আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন, বর্তমান জীবনে মানুষের যে বুদ্ধিবৃত্তি নির্ভর করছে সেরিব্রামের উপরে, সে যদি তার দায়িত্ব যথাযথ পালন না করতে পারে, তাহলে তার ভাঁজগুলিকে পুনর্গঠিত করে তার স্মৃতিকে লোকান্তরে বা পূর্ব জন্মে পিছিয়ে নেওয়া চলে। তখন সে যে সিদ্ধান্ত নেবে তা হবে পূর্ব জন্মাশ্রয়ী। বা পূর্ব জন্মের অভিজ্ঞতা প্রসূত। মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা সে ক্ষেত্রে হ্রাস পাবে কিন্তু মস্তিষ্ক জড় বুদ্ধিসম্পন্ন হবে না।

ডঃ ভাদুড়ির সেই মুহূর্তে মনে হল, নিজের গবেষণাকে যাচাই করার চরম ক্ষণটি এসে গিয়েছে এখনই। তাঁর বয়স হয়ে যাচ্ছে। কতদিন বাঁচবেন না বাঁচবেন কে জানে! না বাঁচলে কালের অতলে তাঁর এই যুগান্তকারী গবেষণা তলিয়ে যাবে নিশ্চয়ই। অথচ তাঁর গভীর বিশ্বাস···।

ডঃ ভাদুড়ি সেই মুহূর্তে সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেললেন। এ রকম অনুকূল মুহূর্তকে কখনোই নষ্ট করা যায় না। একটু রিস্ক্ আছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু ছেলেটা যে এমনিতে বেঁচে যাবে, এ রকম গ্যারান্টিও তো দেওয়া যায় না। বাঁচলেও তার পরিণতি অনিশ্চিত বা তা দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অথচ ডঃ ভাদুড়ি তাঁর গবেষণাকে বাস্তবে প্রয়োগ করলে নিশ্চয় তাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন।

ডঃ ভাদুড়ি অতি দ্রুত নিজেকে তৈরী করে নিলেন।

স্কাল ওপেন করে সার্জেন ভাদুড়ি একেবারে চমকে উঠলেন।

ইস, সেরিব্রাম একেবারে বিপর্যস্ত।

শল্যবিদের দুই আঙ্গুলের মধ্যে যে তীক্ষ্ণ শলাকা ছেদন কর্তনের কাজ করে, তার ক্ষমতা নেই একে স্বাভাবিক ক'রে তোলে। এ একমাত্র বিধাতার কর্ম বা কোনো অলৌকিক উপায়ে যদি কিছু ঘটে যায় তো আলাদা কথা।

কিন্তু ও টি-তে এখন ওসব কথা ভাবার কোনো মানে হয় না।

পুরো আড়াই ঘণ্টা বাদে ডঃ ভাদুড়ি ওটি থেকে বেরিয়ে এলেন। ক্লান্ত কিন্তু আত্মতৃপ্ত। অপারেশন সাকসেসফুল। আশা করছেন ছেলেটি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠবে।

পাড়ার ছেলেরা ইতিমধ্যে ছেলেটির সন্ধান নিয়ে একদিন সার্জেন ভাদুড়ির নার্সিং হোমে এসেছিল।

ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু!

কি, ব্যাপার?

সার্জেন ভাদুড়ি নীচেই চেম্বারে পেসেন্টদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। বেরিয়ে এসে ছেলেদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

ছেলেটির একটা খোঁজ বের করতে পেরেছি। আশে পাশের কোনো পাড়ারই নয়। ও থাকে বেলঘরিয়ার বোস পাড়ায়।

বেলঘরিয়া থেকে একেবারে এখানে!

সার্জেন ভাদুড়ি বিস্মিত হলেন।

ছেলেরা খবরের কাগজের ছোট একটা কাটিং দেখাল পকেট থেকে বের করে।

এই দেখুন।

কদিন আগে ছেলেটি কাউকে কিছু না বলে ক'য়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। বোধ হয় বাবা মার সঙ্গে কোনো রকম রাগারাগি হয়ে থাকবে

সার্জেন ভাদুড়ি নিরুদ্দিষ্টের প্রতি কলমের বিজ্ঞাপনটি পড়তে লাগলেন। ছবি সহ বিজ্ঞাপন। তলায় নাম লেখা, সমীর বোস। সার্জেন ভাদুড়ি ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। ছেলেটির ছবি সন্দেহ নেই।

তিনি সযত্নে বিজ্ঞাপনটি ভাঁজ করতে করতে বললেন, তোমরা আমার মস্ত বড় একটা উপকার করলে। এটি আমি রাখলাম।

ছেলেটি ক্রমে ক্রমে ভাল হয়ে উঠছে। আর একটু সুস্থ হয়ে উঠুক। তারপর ওকে, কি নাম যেন বললে, সমীর, তাই না, হ্যাঁ, সমীরকে আমরা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব! এসো তোমরা।

ছেলেরা চলে গেলে সার্জেন ভাদুড়ি গিয়ে ঢুকলেন সমীরের কেবিনে।

কেমন আছ?

ভাল। তবে ডাক্তারবাবু, কাল রাতে একটানা ঘুমোতে পারিনি। শুধু বাড়ির কথা মনে হচ্ছিল। কতকাল যেন বাড়ির সকলের সঙ্গে দেখা হয়নি।

সার্জেন ভাদুড়ি একটু সময় দিলেন। সমীর কি বলতে চায়, বুঝবার জন্যে তার মুখের দিকে তাকালেন।

কবে বাড়ি যাব?

যাবে এবার। আর দুচার দিন রেস্ট নাও। আমিই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব।

আরও দুচার দিন। ছেলেটি অস্থির হয়ে উঠল। কেন, আজ বিকেলে গেলেই হয় না?

আজ বিকেলে, সার্জেন ভাদুড়ি স্বগতোক্তি করলেন, এ মানসিক অবস্থায় শক লেগে গেলে মারাত্মক হবে। আমি সেটা কখনোই হতে দিতে চাই না।

তারপর সমীরের দিকে ফিরে বললেন, এক কাজ করা যাক। আজ আর কালকের দিনটা বাদ দাও। এ দুদিন আমার একটু কাজ আছে। তোমারও একটু বিশ্রাম হবে।

ছেলেটি বলল, বাড়ির লোকজন এ কদিনে কেউ আসেনি দেখতে আমাকে? আমার মা, আমার দিদি?

সার্জেন ভাদুড়ি সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন, তোমার মা দিদির সঙ্গে এবার তোমার দেখা হবে। আমি তোমাকে শিগগীরই বাড়ি নিয়ে যাবো।

নির্দিষ্ট দিনে অপরাহ্নে গাড়িতে তোলা হল ছেলেটিকে। পাশে গিয়ে বসলেন সার্জেন ভাদুড়ি। তাঁকে অসম্ভব উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছিল।

কটা বাজল ঘড়িতে? আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল ছেলেটি।

কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন ভাদুড়ি।

পাঁচটা পেরেরো।

তাহলে বাড়িতে গেলে মাকে নিশ্চয় পাবো। উঃ, মনে হচ্ছে যেন মাকে কতকাল দেখিনি।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

চারপাশের জগৎ যেন এক নতুন বিস্ময় নিয়ে ছেলেটির চোখে ধরা পড়েছে। গাছের পাতা হাওয়ায় দুলছে। কোথাও ফিনাইলের গন্ধ নেই। সবুজ, সুন্দর পরিবেশে সংস্থ শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

আপনার এই নার্সিং হোমটা কোথায়?

সার্জেন ভাদুড়ি সমীরের কোনো কথারই সরাসরি উত্তর দিতে চাচ্ছিলেন না।

তিনি বললেন, চারপাশে তাকিয়ে তোমার কি চেনা-চেনা মনে হচ্ছে?

সমীরের চেনা জগতের হিসেবের সঙ্গে বোধ হয় চারপাশ মিলল না।

যেন অনেক দূর থেকে সে বলল, কে জানে!

চলমান গাড়ির চারপাশের ছবি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সার্জেন ভাদুড়ি কোনো কথা বলতে চাচ্ছিলেন না। ড্রাইভারকে আগে থেকেই কোথায় যেতে হবে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। গাড়ি গন্তব্য স্থলের দিকে ছুটে চলল।

সেদিন ছিল ছুটির দিন। ফাঁকা রাস্তা। বালিগঞ্জ থেকে বেলঘরিয়া পৌঁছোতে আধঘন্টার বেশি লাগল না। কিন্তু সার্জেন ভাদুড়ির কাছে তাই অনন্তকাল মনে হতে লাগল। নির্দিষ্ট ঠিকানায় গাড়ি গিয়ে পৌঁছোতেই সার্জেন ভাদুড়ি ভেতর থেকেই একবার বাড়িটি লক্ষ্য করলেন। ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। পকেট থেকে কাটিং বের করে আর ঠিকানা মেলানোর দরকার হল না।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে সার্জেন ভাদুড়ি সমীরকে বললেন, তুমি বসো, আমি আসছি।

সমীর বলে উঠল, এ আমরা কোথায় এলাম?

সার্জেন ভাদুড়ি কথার কোনো উত্তর দিলেন না। গাড়ি থেকে নেমে

গেট খুলে তিনি ভেতরে ঢুকলেন।

কলিং বেল বাজানোর আগেই দরজা খুলে গেল। সামনের ঘরেই বোধ হয় কেউ ছিলেন। গাড়ির শব্দেই কৌতূহলী হয়ে তিনি দরজা খুললেন।

কে আপনি ?

আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি সার্জেন ভাদুড়ি। কিন্তু সমীর বোস কি আপনাদের কেউ হয় ?

সার্জেন ভাদুড়ি পকেট থেকে কাটিং বের করছিলেন। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন বোধ হয়।

ইতিমধ্যে আট-দশ বছরের একটি মেয়ে দরজার সামনে এগিয়ে এল। সার্জেন তাঁকে লক্ষ্য করেন নি। কিন্তু সে সমস্ত অবস্থাটা একবার আঁচ করে নেবার চেষ্টা করল। একবার ভাদুড়ির মুখের দিকে তাকাল। একবার রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির দিকে।

তারপর দাদা বলে চীৎকার করে ভাদুড়ির পাশ দিয়ে বাড়ির সামনের ছোট বাগানটুকু পার হয়ে একেবারে তীরের মত ছুটে গিয়ে গাড়ির দরজার উপরে প্রায় আছড়ে পড়ল।

ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটে গেল যে, করার কিছু ছিল না। চীৎকারে বাড়ির সবাই বেরিয়ে এসেছে। কেউ বলছে, বুলু, বুলু এসেছে। কেউ বলছে, সমীর, আমাদের সমীর।

চোখে জল, আদর, ভালবাসা মিশিয়ে সবাই গিয়ে বুলুকে ভেতর বাড়ীতে নিয়ে এল।

কিন্তু এ কোন বুলু ?

মা বুলুকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন, বুলু, বুলু রে! এতদিন কোথায় ছিলি! মা বাবার কথায় কি রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়। আহা, বাছা আমার রোগা হয়ে গেছে।

মা বুলুর মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

মার আদরে বুলু আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল।

আপনি কে ? আমাকে আদর করছেন কেন ? আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না।

মা হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে ছেলেকে আরও জড়িয়ে ধরলেন।

এ তোর কে কি করল ?

ছোট বোনও ফোঁপাচ্ছে। সে দাদার কোলে উঠে বলল, দাদা, দাদা,

আমি মিষ্টি।

সমীরের চোখও ভিজে উঠল। মিষ্টির পিঠে সে হাত বুলোতে লাগল। কিন্তু মিষ্টিকে সে চিনতে পেরেছে বলে মনে হল না।

সার্জেন ভাদুড়ি গৃহকর্তাকে ডেকে বললেন, আপনি বোধ হয় সমীরের বাবা। একটু আড়ালে আসবেন। আপনার সঙ্গে আমার কটা কথা আছে।

ভিড় এড়িয়ে একপাশে আসতে আসতে সার্জেন ভাদুড়ি সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললেন। পাড়ার মোড়ে বিকেলের দুর্ঘটনা, কাগজের কাটিং থেকে ছেলেটির পরিচয় সংগ্রহ এবং নার্সিং হোমে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করে সুস্থ করে তোলা—কোনো কথাই বাদ দিলেন না।

শুধু নিজের গবেষণা লব্ধ ফলকে কি ভাবে ছেলেটির মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারে প্রয়োগ করেছেন—সেই কথাটুকু গোপন রাখলেন।

সমীরের বাবা সার্জেন ভাদুড়ির হাত ধরে ফেললেন। বললেন, এ কি হল ছেলের আমার। ভাল করে যদি বা তুললেন, কিন্তু এ যেন আমাদের সেই বুলু নয়। এ তো আমাদের কাউকেই চিনতে পারছে না।

কথা বলার মাঝে হঠাৎ সমীর সকলের ভালবাসার বাঁধনকে ছিঁড়ে ফেলে সরাসরি সার্জেন ভাদুড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন ? আমি এদের কাউকে চিনি না। আমার নাম মনোমোহন পাত্র—কিন্তু এরা আমাকে সমীর বুলু কি সব বলে ডাকছে। তা ছাড়া এ বাড়িও আমাদের বাড়ি নয়। এ বাড়িতে আমি কোনোদিন থাকিনি। আমাকে আপনি প্লিজ আমার বাড়িতে পৌঁছে দিন।

সার্জেন ভাদুড়ির সেই মুহূর্তে মনে হয়, এখানে একটা মুহূর্তও থাকা বোধ হয় আর ঠিক হবে না।

কঠিন মুখে তিনি বললেন, একে আমার নার্সিং হোমে নিয়ে যাচ্ছি। আরও কটা দিন ও আমার নার্সিং হোমেই থাকবে।

বাড়িতে মৃদু প্রতিবাদের ঢেউ উঠল। কিন্তু সে ঢেউ যুক্তির ধাক্কায় ভেসে গেল। যে ছেলের স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছে তাকে বাড়িতে রাখার চেয়ে চিকিৎসা করানোই ভাল, বিশেষ করে এখনও যখন খুব একটা বেশি দেরি হয়ে যায় নি।

কথা রইল, মা বাবা আর একমাত্র ছোট বোন পরের দিন বিকেলে যাবে।

সার্জেন ভাদুড়ি যদি অবস্থা অনুকূল মনে করেন তো সমীরের সঙ্গে ওঁদের দেখা হবে।

এদিকে মনে মনে সার্জেন ভাদুড়ি প্রমাদ গুনছেন। মা, বাবা, বোনকে তো যেতে বললেন পরের দিন বিকেলে। কিন্তু মাত্র ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে গিয়ে তাঁরা করবেনই বা কি? এখন যা অবস্থা ইতিমধ্যে তার কোনো পরিবর্তন হয়ে যাবে মনে হয় না।

কিছুটা অনুশোচনা হল ভাদুড়ির। সমীরকে বাঁচিয়েছেন তিনি ঠিকই কিন্তু গবেষণায় তাঁর বক্তব্যকে যাচাই করতে গিয়ে এ কি পরিণতি ডেকে নিয়ে এলেন? এর চেয়ে বোধ হয় ছেলেটি না বাঁচলেই ভাল হত।

সার্জেন ভাদুড়ি আর ভাবতে পারছিলেন না। সমীরকে নিয়ে গাড়িতে উঠতেই ড্রাইভার স্টার্ট দিল। সমীরের আত্মীয়স্বজন পেছনে দাঁড়িয়ে রইল হতভম্বের মত।

গাড়ি কিছুটা এসে বড় রাস্তায় পড়ার মুখে অকস্মাৎ আর একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ছেলেটি ব্যাক স্ক্রীনে হঠাৎ নিজেকে দেখতে পেল। দুর্ঘটনার পরে এই প্রথম তার আত্মদর্শন আর সঙ্গে সঙ্গে সে আর্তনাদ করে উঠল।

এ কে! এ তো আমি নই। এ আমার কি হল?

বিভ্রান্তিতে সমীর একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে।

আমাকে আপনি নিয়ে চলুন। ৩/১২ মহিম ব্যানার্জি রোড, ব্যারাকপুরে। ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে বলুন। ব্যারাকপুরে গাড়ি পৌঁছোলে আমি আপনাকে বাড়ি চিনিয়ে দিতে পারবো। প্লিজ, আমি বাড়ি যেতে চাই।

সার্জেন ভাদুড়ি ভেবে দেখলেন, বেলঘরিয়ার এই অঞ্চল থেকে ব্যারাকপুর খুব একটা বেশি দূর হবে না।

কিন্তু এখন সেখানে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

এমনিতেই সমীরের মাথায় অনেক চাপ পড়েছে। যদি এর পরে আরও শক লাগে তাহলে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু সেখানটাও একবার যাওয়া দরকার। জল কতদূর গড়ায় তিনি দেখতে চান।

ড্রাইভারকে তিনি বললেন, গাড়ি ঘোরাও। ব্যারাকপুর চল।

সার্জেন ভাদুড়ি সমীরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন। তার চোখের কোণে জল চিকচিক করছে।

ব্যারাকপুরে যে বাড়িটার সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াল, অঞ্চলের মধ্যে

সেটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় বাড়ি। সার্জেন ভাদুড়ি তাকিয়ে দেখলেন, সে কালের বনেদী বাড়ি, বিরাট চত্বরের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

এই বাড়ি। এই তো আমাদের বাড়ি।

সার্জেন ভাদুড়ি গাড়ির দরজা খুলে নামার আগেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে সমীর গেল ভেতরে।

মা। মা। দিদি, দিদি।

সার্জেন ভাদুড়ি সমীরের পিছু পিছু চললেন। দরজার উপর নেম প্লেট। তাতে লেখা এ এন পাত্র।

না। তাহলে বাড়ির ভুল নেই।

ডাকাডাকির শব্দ শুনে এক ভদ্রমহিলা এসে দরজা খুললেন।

যেন কতদিনের রুদ্ধ জলস্রোত এক মুহূর্তে বাঁধন হারা হয়ে গেল এমনভাবে ছেলেটি ঝাঁপিয়ে পড়ল মহিলার কোলের মধ্যে।

মা, মাগো!

পিছিয়ে গেলেন মহিলা অতর্কিতে।

তুমি কে?

ছেলেটি আকুল হয়ে বলে উঠল, তুমি আমাকে চিনতে পারলে না? আমি মনু, মনোমোহন। কিন্তু তোমার এ কি শরীরের হাল হয়েছে? দিদি কোথায়? দিদি?

এমন সময়ে অন্দরমহলের পর্দা সরিয়ে আর এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। ছেলেটির চেয়ে বয়সে অনেক বড়—বছর ৩৬ থেকে ৪০ এর মধ্যে হবেন। চোখে ভ্রূকুটি নিয়ে তিনি ছেলেটিকে লক্ষ্য করলেন।

দৌড়ে এগিয়ে ছেলেটি গিয়ে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল তাঁকে।

দিদি, তোরও অনেক বয়স বেড়ে গেছে যেন। হঠাৎ তোর এ রকম হল কি করে?

দিদির মুখের ভাব কিন্তু এতটুকু বদলাল না।

ছেলেটির হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে তিনি একটু সরে দাঁড়ালেন। আর ছেলেটি তাল সামলাতে না পেরে সোজা গিয়ে পড়ল দরজার উপরে।

ধাক্কাটা বোধ হয় একটু বেশিই লেগেছিল—ঘুরে মাটিতে পড়ে গিয়ে একেবারে অজ্ঞান।

সার্জেন ভাদুড়ি দৌড়ে গেলেন। মাথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লক্ষ্য করলেন, পাল্স্ দেখলেন, না জীবনের আশঙ্কা এক্ষুনি আছে মনে হচ্ছে না। কিন্তু ব্রেনটা আর একবার পরীক্ষা করা দরকার।

ইস্, এই সময়ে একটা ধাক্কা। জানি না কি হবে এর জন্যে।

সোফার উপরে সবাই ধরাধরি করে শুইয়ে দিলেন।

প্রবীণা মহিলা বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো?

নিজের পরিচয় দিয়ে দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে সার্জেন ভাদুড়ি বললেন, অপারেশনের পরে সুস্থ হয়ে উঠে ছেলেটি এই বাড়ির কথাই বলেছিল। তাই এখানে নিয়ে এসেছিলাম।

তা, মনে হচ্ছে, কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে। কি যে হল, আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না।

কিন্তু সার্জেন ভাদুড়ি নিজের গবেষণার কথা কিছুই প্রকাশ করলেন না।

প্রবীণা ভদ্রমহিলা একটু ইতস্তত করে বললেন, পুরোনো কথা, আজ আর আলোচনা করে লাভ নেই। তবে আজ থেকে ১৬।১৭ বছর আগে আমার বারো বছরের ছেলেটি মারা যায়। তার নাম মনু। মেয়ের বয়স তখন ১৬। কিন্তু সে সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে আজ আর আমাদের ভাল লাগছে না।

ছেলেটিকে গাড়িতে শুইয়ে নিয়ে নার্সিং হোমে ফিরে এলেন সার্জেন ভাদুড়ি। এই মুহূর্তে অবজারভেশনে রাখা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

পরের দিন সকাল দুপুর সারাক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্নের মত শুয়ে রইল সমীর। সার্জেন ভাদুড়ি শুধু তাকে মাঝে মাঝে দেখে গেলেন। তিনি কোনো কথা জিগেস করেন নি সমীরকে। সমীরেরও কথা বলার মত বোধ হয় অবস্থা ছিল না।

বিকেল বেলা বেলঘরিয়া থেকে এসে পড়লেন সমীরের মা, বাবা আর ছোট বোন।

লাউঞ্জে সার্জেন ভাদুড়ির সঙ্গে মুখোমুখি।

সার্জেন ভাদুড়ি বললেন, ওর সঙ্গে দেখা করাটা বোধ হয় এখন ঠিক হবে না। কালকের মেনটাল শক ও এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ওকে এ সময়ে রেস্টে রাখাই ভাল।

সমীরের বোন বলল, একবার দেখে যাব না দাদাকে?

সার্জেন ভাদুড়ি ইতস্তত করলেন। কি হবে দেখা করে? আবার

তো সেই কালকের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। সে পুনরাবৃত্তি আদৌ সার্জেন ভাদুড়ির কাছে অভিপ্রেত নয়। অথচ তার গবেষণার সাফল্য এই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আর সে সাফল্য যুগান্তকারী। তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তিনি যে পেপার পাবলিশ করবেন তা নিশ্চয়ই সমস্ত বোদ্ধা সমাজে আলোড়ন তুলবে। সার্জেন ভাদুড়ির গবেষণাকে যাঁরা উপহাস করছিলেন বা সন্দেহের চোখে দেখছিলেন, তাঁদের মুখ নিশ্চয়ই এবার বন্ধ হবে।

কিন্তু সমীরের এ অবস্থায় কি করা যায়? এ জীবন সমীরের কাছে দুর্বিষহ। সমীরের মা বাবার কাছেও। আর ওর ছোট বোনটা?

এর চেয়ে গবেষণার ব্যর্থতাই বোধ হয় ভাল ছিল। হয়তো ছেলেটি তাতে বাঁচতো না। তবুও।

কিন্তু এখন তিনি কি করেন? তাঁর নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে।

ছোট বোন দাদাকে দেখতে চাচ্ছে। কিন্তু দাদা তাকে চিনতে পারবে না। সে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য।

মিষ্টির দিকে তাকিয়ে সার্জেন ভাদুড়ি বললেন, ঠিক আছে, তুমি দাদার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছো। দেখা করে যাও দরজার কাছ থেকে। কিন্তু ভেতরে যাবে না।

তারপর মা বাবাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারাও মিষ্টির সঙ্গে যান।

কেবিনের দরজার সামনে থেকে চোখে জল ভরা তিনি জোড়া আকুল চোখ গিয়ে পড়ল সমীরের ওপরে।

আর সমীর যেন এই মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল। সে চোখ মেলে তাকাল।

মিষ্টি!

দাদা!

আয়, কাছে আয়।

সার্জেন ভাদুড়ি সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন। মুহূর্তে তিনি চমকে উঠলেন।

এ কি! কি হল এ?

তাহলে তো সমীর বর্তমানের স্মৃতিতে আবার ফিরে এসেছে।

মুহূর্তে মনে পড়ল কাল বিকেলের ওই আঘাতের কথা। শাপে বর।

অপারেশনের পরে খুব বেশি দিন কেটে যায়নি বলে থাকায় একটা সুফল ফলে গেল। এ একেবারে ভাবাই যায় না।

সমীরের মা বোন সমীরকে ঘিরে রেখেছে।

সমীরের বাবা সার্জেন ভাদুড়ির হাত ধরে বললেন, আপনাকে আর কি যে বলব? আপনি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

সার্জেন ভাদুড়ি বিনীত হয়ে বললেন। না, না, এ কি বলছেন! আমি আর কতটুকু করেছি? □

অনীশ দেব
পৃথিবীর ছেলেখেলা

প্রথম দিন

আজ দিদিমণি মাকে আর বাবাকে ডেকে বলেছে যে আমার নাকি বুদ্ধি কম, বোকা, ক্লাসে এরকম ছেলে একটাও নেই। কিন্তু আজ আমি একটা তারা বানিয়েছি, কি সুন্দর, কি রকম আলো। ওটা দেখে দিদিমণি খুব অবাক হয়ে গেছে, কিন্তু ভাবটা এমন যেন কিছুই হয়নি। বললো যে শুধু শুধু এতো শক্তি নষ্ট করে ওটা বানানোর কি দরকার ছিলো? আমি কিচ্ছু বলিনি। বলে কি হবে? সত্যি, তারাটা কি সুন্দর!

দ্বিতীয় দিন

আজকে অনেকগুলো গ্রহ তৈরী করেছি: চারটে বড়, দুটো মাঝারি, আর তিনটে ছোট ছোট। দিদিমণি দেখে খুব হেসেছে। বলেছে, এতগুলো গ্রহ তৈরী করে লাভ কি হলো? যেখানে ছ' ছ'টা গ্রহই হয় খুব ঠাণ্ডা নয় খুব গরম, তাতে প্রাণ তৈরী হতে পারবে না, শুধু শুধু সময় নষ্ট হলো! আর বড়গুলোর ওজন বিরাট, আর নানান বিষাক্ত পদার্থে তৈরী—কোন কাজে আসবে না।

দিদিমণি কিচ্ছু বোঝে না। কাজে আসুক আর না আসুক তৈরী করার মধ্যে একটা দারুণ আনন্দ আছে।

ছ' নম্বর গ্রহটার চারদিকে যে রিংগুলো রয়েছে সেগুলো দেখতে কিন্তু চমৎকার!

তৃতীয় দিন

আজকে প্রাণ তৈরী করলাম। এখন বুঝতে পারছি আমাদের সবাই কেন কিছু তৈরী করাটাকে সবচেয়ে বেশি দাম দেয়।

বড় বড় জ্ঞানীগুণীদের মুখে শুনেছি বেঁচে থাকার অর্থ কি। তখন ভাবতাম, তার মানে শুধু বুঝি বয়েসে বেড়ে যাওয়া, বুড়ো হওয়া। এর আগে বেশ আনন্দেই ছিলাম : অন্য বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করতাম, মহাশূন্যের বুকে' যখন তখন পাড়ি জমাতাম, কোন অস্থায়ী তারায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে 'নোভা তৈরী করতাম, আরো কত কি!

কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি, জীবনের একটা অর্থ আছে, দাম আছে।

দিদিমণি ঠিকই বলেছিলো, দুটো মাঝারি আর একটা ক্ষুদে গ্রহতেই প্রাণ তৈরীর পরিবেশ রয়েছে। তিনটে গ্রহেই প্রাণ তৈরী করলাম, কিন্তু সূর্য থেকে তিন নম্বর গ্রহটাতেই কেবল প্রাণ টিঁকে থাকতে পারলো।

আমি শুধু একটা নিয়মই তৈরী করে দিলাম—সেটা হলো, বেঁচে থাকো!

চতুর্থ দিন

তিন নম্বর গ্রহটা আমার নাওয়া-খাওয়া কেড়ে নিয়েছে। ফুলে ওঠা সমুদ্রের মধ্যে প্রাণীরা কিলবিল করছে।

আজ আর একটা নতুন নিয়ম জুড়ে দিয়েছি : বংশবৃদ্ধি করো!

যে সব প্রাণী ধীরে ধীরে সমুদ্রে তৈরী হচ্ছে, সেগুলোর গঠন বেশ জট পাকানো, ছেলেরা সব আমাকে খেলতে ডাকছে, কিন্তু এতে এমন মজা যে ছেড়ে যাওয়া যায় না।

পঞ্চম দিন

বার বার আমি সমুদ্রের প্রাণীদের ধরে ডাঙায় নিয়ে এসেছি, বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। যে ক'দিনে মরে যাওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি দিন ওরা বেঁচে থেকেছে। কিন্তু তারপর মরে গেছে। তবে অনেকদিনের চেষ্টায় আমিই জিতলাম। ওদের কারো কারো ডাঙা বেশ সয়ে গেলো।

ঠিকই ভেবেছিলাম, সমুদ্র ওদের জীবনে গতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ ডাঙার প্রাণীগুলো সমুদ্রের প্রাণীদের পেছনে রেখে তরতর করে উন্নতির পথে এগিয়ে চললো। বেশ ভালো লাগছে।

ষষ্ঠ দিন

এতোদিন যা করেছি তা আজকের তুলনায় কিছুই না। আজ আমি বুদ্ধি তৈরী করেছি।

আজ একটা তিন নম্বর নিয়ম জুড়ে দিয়েছি : জানার চেষ্টা করো।

ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণী থেকে শেষ পর্যন্ত একটা দারুণ প্রাণী তৈরী হয়েছে। এটার দুটো পা, সোজা হয়ে হাঁটে, চলার সময় চারদিকে ফিরে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। প্রাণীটার হাত দুটো খুব দুর্বল, বুদ্ধিও তেমন নয়, কিন্তু সে একটার পর একটা সব জয় করে চলেছে। এমন কি পরিবেশকেও পর্যন্ত সে বাগ মানিয়েছে!

তারপর যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বের করার চেষ্টা করছে আমার পরিচয়। দারুণ মজা লাগছে।

সপ্তম দিন

আজ ইস্কুল ছুটি।

এতো কষ্ট করে এতো কিছু তৈরী করার পর আজ খেলতে খুব ভালো লাগছে।

এ যেন কোন সাদা-বামন তারার প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে হারিয়ে দিয়ে ছুটে চলা, তারপর বিশ্রাম নিয়ে ক্ষয়ে যাওয়া শক্তি ফিরিয়ে আনা!

আজ দিদিমণি আবার মায়ের সঙ্গে বাবার সঙ্গে কথা বলেছে। দিদিমণি বলেছে, গত ক'দিনে আমার নাকি দারুণ উন্নতি হয়েছে। তবে আমার তৈরী জিনিসগুলো ঠিক নিয়মমাফিক হয়নি, উল্টোপাল্টা খাপছাড়া হয়েছে। তাছাড়া, কাজটা নাকি খুব বিপজ্জনক ছিলো।

দিদিমণি বলেছে, এগুলো সব ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

কিন্তু আমার বাবা-মা মত দেয়নি, তারা বলেছে সূর্য থেকে তাপ নিয়ে নিয়ে তিন নম্বর গ্রহের প্রাণীদের এমন একটা অবস্থা হবে যে তারা নিজেরাই এক তাপ পারমাণবিক বিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। আমি ঐ প্রাণীদের যে সব নিয়মে বেঁধেছি তাতে নিজে থেকেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ওরা একদিন বিলুপ্ত হবে।

দিদিমণি বললো যে এর দায়িত্ব আমার মা-বাবা তো আর নেবে না, সুতরাং দিদিমণিকেই যা ব্যবস্থা করার করতে হবে। কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়।

তর্কে শেষ পর্যন্ত কে জিতলো জানি না, আমি নিজের মনে সেখান থেকে সরে এসেছি। আমার মনটা যেন কেমন করছে। খুব খারাপ লাগছে।

ওটা নষ্ট হলে ক্ষতি কি? ওটা তো পুরোনো হয়ে গেছে! আমি বরং এর চেয়েও ভালো কতগুলো গ্রহ-তারা তৈরী করবো।

কিন্তু হাজার হলেও এটাই তো আমার হাতে তৈরী প্রথম জিনিস, এটা নষ্ট করতে গেলে মন খারাপ তো করবেই।

যদি কোন প্রকাণ্ড ধূমকেতু সূর্যের দিকে সোঁ সোঁ করে ধেয়ে যায় তাহলে সে দৃশ্য আমি সইতে পারবো না। তার চেয়ে বরং—

অষ্টম দিন

*　　　*　　　*
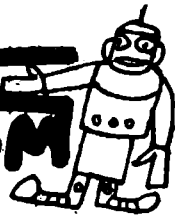
বুকচাপা নীরবতা। সমস্ত হলঘর যেন বোবা…মন্ত্রবলে স্তব্দ হয়ে গেছে সমস্ত তর্ক বিতর্কের ঝড়। অধীর উত্তেজনায় উশখুশ করছে সকলে। দপদপ করে আলোগুলো জ্বলছে আর নিবছে লেন্সের মধ্যে দিয়ে। চৌকো চৌকো ধাতব মাথাগুলো দুলছে অল্প অল্প করে।

—প্রোব ৮৩১৪ থেকে জরুরী বার্তা এসেছে যে আমাদের গ্রহ অভি-মুখে বিরাট অভিযানের তোড়জোড় সুরু করেছে পৃথিবীর মানুষ। ঘরের মধ্যে গম্ গম্ করে উঠল ঘোষকের আবেগবর্জিত কণ্ঠস্বর।

চকিতের মধ্যে কেমন যেন সাড়া পড়ে গেল উপস্থিত সকলের মধ্যে। সারি সারি সবাই বসে আছে অবিচল শৃংখলায়। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার নিশ্চল হয়ে গেল সকলে। চোখের আলোগুলো আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। অথচ কোন পরিবর্তন হল না ভাবলেশহীন মুখগুলোর।

অবশেষে সামনের সারির একজন নিস্তব্দতা ভঙ্গ করল।

—অবাক হবার কী আছে এতে? তিরিশ হাজার বছর আগেই তো সাবধান করে দিয়েছিলাম আমি।

—কিন্তু সে তো কেবল সম্ভাবনার কথা। অগ্রগতির আরো অনেক সম্ভাবনার পথও তো খোলা ছিল তখন। গম্ গম্ করে উঠল বক্তার কণ্ঠস্বর।

—কিন্তু পৃথিবীতে মানুষ আবির্ভাবের আগে তো এটা একটা নেহাৎই সম্ভাবনাই ছিল। মানুষ আবির্ভাবের পরেইতো দেখা দিল যাবতীয় সমস্যা। মন্তব্য করল সামনের সারির আর একজন।

উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়াল আরো একজন উপদেষ্টা। যান্ত্রিক ভাবে

দ্রুত এগিয়ে গেল ডায়াসের দিকে। চীৎকার করে বলে উঠল—শুধু সম্ভাবনার কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না মোটেই। আমরাই তো চেয়েছিলাম বায়োলজিক্যাল রোবট। আর তার ফলেই তো তৈরী হয়েছে পৃথিবীর মানুষ। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমরা…হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা।

—উত্তেজিত হবেন না। শান্ত হন আপনারা। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির ঊষা লগ্নে কে ভেবেছিল ঐ দুর্বল, স্বল্পায়ু, ল্যাকপ্যাকে দেহগুলোর মধ্যে একে একে দেখা দেবে দুর্বার-শক্তি? যাদের জীবন কেবল কয়েকদিনের সমষ্টি মাত্র তারাই কিনা বুদ্ধিমত্তায়—জ্ঞানের গভীরতায়—হারিয়ে দেবে আমাদের? এ শুধু অবিশ্বাস্যই নয়…মনে হয়—উন্মাদের প্রলাপ! চেয়ারম্যানের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের সুর।

—এক্সপেরিমেন্টের সুরুতেই তো এমনটা ভাবা উচিত ছিল আমাদের। যারা দুর্বল…স্বল্পায়ু তাদের পক্ষেই তো সম্ভব এসব! ডায়াসের কাছে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল সেই উপদেষ্টা।

—এ তো প্যারাডক্স! কিন্তু প্যারাডক্সের তো কোন স্থান নেই আমাদের বিজ্ঞানে। আমি তো কোন লজিক খুঁজে পাচ্ছি না এর মধ্যে। দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠস্বর চেয়ারম্যানের।

—লজিক নেই? এর চেয়ে, স্পষ্ট লজিক আর কি হতে পারে সেটা তো বুদ্ধিতে আসছে না আমার। ন্যাচারাল সিলেকসানের মাধ্যমেই এভ্যুলিশান চলেছে পৃথিবীতে। আর তার ফলেই আমাদের চেয়েও উৎকৃষ্ট নিখুঁত হয়ে উঠেছে মানুষের মস্তিষ্ক। এটাই তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক…যুক্তিগ্রাহ্য লজিক্! উপদেষ্টার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার আভাস।

—কিন্তু কয়েক লক্ষ বছর আগেই তো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ন্যাচারাল সিলেকসানের মেকানিজম। কিন্তু তার পরেও কেন দ্রুত উন্নতি হচ্ছে পৃথিবীর ঐ দুর্বল ক্ষীণ মানুষদের?

ধাতব গলায় হেসে উঠল উপদেষ্টা। অস্বস্তিতে ভরে উঠল সমস্ত হলঘর।

—ভুলে যাচ্ছেন কেন চেয়ারম্যান সাহেব, মানুষ তো অমর নয়…মানুষ যে মরণশীল। জীবন ওদের খুবই ছোট। তাই ওদের ব্যস্ততার সীমা নেই। তাড়াতাড়ি শেষ করতে চায় অনেক কিছু। আজ নয় কাল বলে দীর্ঘসূত্রতার কোন অবকাশ নেই মানুষের জীবনে। আমাদের মত একশ হাজার পরে সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করার বিলাসিতার সামান্যতম কোন সুযোগ নেই পৃথিবীর মানুষদের। কারণ জীবন যে ওদের খুবই ছোট।

আমাদের তুলনায় ওদের আয়ু যে একেবারে নগণ্য।

—মানে…মানে আপনি কি আমাদের জীবনের মূলসূত্র সম্পর্কে কটাক্ষপাত করছেন! চেয়ারম্যানের কণ্ঠে ভেসে উঠল বিস্ময়ের চিহ্ন।

—কটাক্ষপাত! একে কি আপনি কটাক্ষপাত বলেন? আমি শুধু যা ঘটেছে তাই বলবার চেষ্টা করেছি মাত্র। সত্যি কথা বলা কি কটাক্ষ-পাত! গম্ভীর স্বরে বলে উঠল উপদেষ্টা।

চেয়ারম্যান কোন কথা বলার আগেই গভীর ভরাট স্বরে বলে উঠল একজন একেবারে পেছন থেকে।

—কটাক্ষপাত কেন বললেন চেয়ারম্যান সাহেব? জীবনের মূলসূত্রগুলো সম্বন্ধে প্রশ্ন করা কি অন্যায়? শুধু কি মুখ বুজে মেনে চলতে হবে মূলসূত্রের কমা, সেমিকোলন আর ফুলষ্টপ!

থম্‌থমে হয়ে উঠল সমস্ত হলঘর। অচঞ্চল চোখের দীপশিখাগুলো নিষ্কম্প নিথর। বেশ কয়েক মুহূর্ত পরে বলে উঠলেন চেয়ারম্যান—কি… কি বলতে চাইছেন…আপনি…আপনারা?

—বিশেষ কিছুই বলতে চাই না। শুধু পৃথিবীর মানুষের উপরে আমাদের তত্ত্বাবধানের ফলাফলগুলো জানাতে চাই সকলকে। বলতে চাই আসলে যা সেই ঘটনা।

—কিন্তু আলোচ্য বিষয় থেকে সরে আসা কি উচিত হবে আমাদের? পাল্টা এক কূটনৈতিক চাল চাললেন চেয়ারম্যান।

—না, না, আলোচ্য বিষয় থেকে মোটেই সরে যাচ্ছি না আমরা…বরঞ্চ অঙ্গাঙ্গীভাবে এটাই জড়িয়ে আছে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে।

— বলতে দিন। বলতে দিন চেয়ারম্যান সাহেব। বহু কণ্ঠের ধ্বনি একসঙ্গে।

—বেশ—তাই হোক। তবে বেশী বিষয়ান্তরে যাবেন না কিন্তু……

এবার মাঝের সারি থেকে আর একটি ছোট রোবট এগিয়ে এল ডায়াসের কাছে।

—পৃথিবীর বুদ্ধিমান জীব মানুষের ওপর নজর রাখতে গিয়ে আশ্চর্য এক বিষয়ের কথা জানতে পেরেছি। জানতে পেরেছি যে মানুষরা তাদের গবেষণায় শুধু মাত্র লজিক এর উপর নির্ভর করে না। আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আর এক শক্তিশালী মাধ্যমের আশ্রয় নেয় ওরা অর্থাৎ কোন অঙ্ক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না এই মাধ্যমের। মানুষের ভাষায় এটা ইনটিউশন বা

সহজাত অনুভূতি।

—আমি বলি কি যে বন্ধ করে দেওয়া হোক পৃথিবীর উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা। বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল চেয়ারম্যান।

—এত সব খরচ পত্রের কি হবে তাহলে? প্রশ্ন করে উঠল আর একজন।

—রাইট অফ করে দোব সব!

—আমাদের স্যাটেলাইট, বেস আর স্পেশালি ট্রেণ্ড ফোর্সয়ের কি হবে?

—অন্য কাজে লাগাতে হবে। নয় তো খুলে ফেলতে হবে।

—তাহলে কি হবে পৃথিবীর মানুষদের?

—যা অবশ্যম্ভাবী তাই হবে। আমাদের অভাবে কিছু দিনের মধ্যেই ভেঙে পড়বে মানুষদের ঐ দুর্ভেদ্য সভ্যতা।

—ভুল ভুল ভুল। পৃথিবী সম্বন্ধে সব লজিকই ভুল আপনাদের। বিশদ ভাবে বুঝিয়ে বলার সময় নেই এখন। তবে ওরা এতই এগিয়ে গেছে যে আমাদের মত রোবট তৈরীও করে ফেলেছে।

—সেকী...আমাদের মত...মানে আমাদের তৈরী করতে সুরু করেছে?

—শুধু কি তাই......আমরা যে রোগের জীবাণু ছড়িয়ে মড়কের সৃষ্টি করতাম, তাও অচল এখন। সব রকমের প্রতিষেধক করায়ত্ত ওদের। বার্ধক্য আর মৃত্যুকে জয় করার চেষ্টা চলছে অবিরত। গাছের কলম করার মত মানুষের ক্লোনিং—এখন অতি সহজ ওদের কাছে। টেষ্ট টিউব বেবী, ল্যাবোরেটারী বেবী এখন আর নতুন নয় মোটেই। ক্রোমোসোমসের জিন পাল্টে এক নতুন মানব সভ্যতার জন্ম দিতে এগিয়ে চলেছে। রিমোট কন্ট্রোল আর রোবট দিয়ে মহাকাশের দূর দূরান্তে গ্রহের সম্পদ আহরণে উদ্যত পৃথিবীর মানুষ। আমাদের গ্রহেও অভিযান শুরু করবে খুব শীগগীরই।

—এ যে অবাস্তব...অসম্ভব...অবিশ্বাস্য......

সারা হল জুড়ে ধাওব কণ্ঠের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ঘুরে ফিরে গুমোট করে তুললো ঘরের বাতাস।

—কিন্তু...এ সব হল কেমন করে? প্রশ্ন করল ছোট রোবট।

কে উত্তর দেবে প্রশ্নের? সকলেই নির্বাক, নিশ্চুপ। এই অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউই।

বুক চাপা নিঃস্তব্দতা ভেদ করে প্রশ্ন করে উঠল একজন—তবে কে সৃষ্টি করেছে আমাদের? কারা আমাদের সৃষ্টিকর্তা?

উত্তেজনার ঝড় উঠল ঘরের মধ্যে। মুহূর্তে মুহূর্তে দারুণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠছে প্রত্যেকেই। নিষিদ্ধ…সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এ সব প্রশ্ন। এই প্রশ্নের আলোচনার অর্থই হল আইনবিরোধী কাজ করা—অমান্য করা দেশের আইনকে।

তীব্র লাল আলো জ্বলে উঠল চেয়ারম্যানের চোখে। বিপদসূচক নিশানা। কিন্তু এবার আর বাধা মানলো না রোবট। ধীর পদক্ষেপে ছোট রোবট এগিয়ে গেল ডায়াসের উপর। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে দুচোখের আলো। চ্যালেঞ্জের নিশানা জ্বালিয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ছোট রোবট। ওর দেখাদেখি আরো কয়েক জন যুবক রোবট চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

—আর বাধা দেবেন না চেয়ারম্যান সাহেব। কোন শাসনই আজ মানবো না আমরা। হঁ্যা, হঁ্যা, আমরা জানি যে আজকের আলোচ্য বিষয় নয় এটা। কিন্তু জাতির এই এই চরম মুহূর্তে শুধু আইন মেনে সর্বনাশের বোঝা মাথায় নেওয়ার কোন যুক্তি নেই আর। ছোটখাটো সব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে আমাদের। মানতে হবে আসল সত্যি।

—ঠিক আছে। তাহলে এই কাউন্সিলই বিচার করুক সব প্রশ্নের… অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিরুপায় হয়ে প্রস্তাব করল চেয়ারম্যান।

শ্রোতৃমণ্ডলীর চোখে জ্বলে উঠল সবুজ আলো। সম্মতির চিহ্ন।

যুবক রোবটের দল উঠে পড়ল ডায়াসের উপর। উত্তেজনায় তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে প্রত্যেকের চোখের আলো।

—পৃথিবীতে প্রাণের সূত্রপাত ঘটিয়েছি আমরা আমাদেরই বুদ্ধির জোরে মানুষের উদ্ভব হয়েছে পৃথিবীর বুকে। মানুষ আবার রোবট তৈরী করতেও শিখেছে। সব কিছুরই সুরু বা আরম্ভ আছে জগতে! আছে সূত্রপাত। আর তার মানেই হল আমাদেরও আছে কোন সৃষ্টিকর্তা। কে সেই সৃষ্টিকর্তা?

—আমরা…আমরা তো আদি অনন্ত কাল ধরে আছি এখানে। বক্তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল চেয়ারম্যান।

—এমন কি এই গ্রহসৃষ্টির আগেও! বিদ্রূপ করে উঠল এক যুবক রোবট।

—এর অর্থ হল যেমন করেই হোক জন্ম হয়েছে আমাদের। রহস্যের গভীরে ঢাকা রয়েছে আমাদের সৃষ্টি-রহস্য। কিন্তু কেমন করে? আমরাই কি আমাদের সৃষ্টিকর্তা! আপনা থেকে মিলেমিশে কি এটম আর মলি-

কিউল তৈরী করতে পারে রেডিও, ট্রানজিস্টার, ফোটোসেল? না, না, নিশ্চয় কোন রহস্য আছে এর মধ্যে!

—এ আলোচনার কি শেষ আছে? কে জবাব দেবে তোমাদের প্রশ্নের? বরং আরো হতাশা আসবে এসব আলোচনায়। চেয়ারম্যানের কণ্ঠে নিস্তেজ ভাব।

—তাই যদি হয় তবে বন্ধ করা হোক এক্সপেরিমেন্ট। বন্ধ হোক পৃথিবীর উপর পরীক্ষানিরীক্ষা। পেছন থেকে বলে উঠল অন্য একজন।

—বেশ, ভোট নেওয়া হোক তাহলে। প্রস্তাব করল চেয়ারম্যান।

—না, না, এক্সপেরিমেন্ট থামানো হবে না কোনমতেই···কয়েকজন বলে উঠল সামনের সারি থেকে।

—কেন? কেন বন্ধ হবে না?

—কারণ···কারণ অতি সহজ। এই এক্সপেরিমেন্ট আমরা পরিচালনা করছি না।

—এ কথার অর্থ কি? নির্বোধের মত কথা বলার কোন মানেই হয় না। বুঝিয়ে বলুন কি বলতে চাইছেন আপনি?

হলঘরের একবারে শেষ সারি থেকে উঠে দাঁড়াল বিশাল কুচকুচে কালো এক রোবট। বিশাল দেহের চারপাশের মরচে পড়ে মসৃণতা নষ্ট হয়ে গেছে। মহাকালের ছাপ সর্বাঙ্গে। অতি প্রাচীন বৃদ্ধ সেই রোবট ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল ডায়াসের সামনে। গ্রহের প্রাচীনতম রোবট নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল চেয়ারম্যানের পাশে। আয়তাকার প্রকাণ্ড মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিল চারপাশে। উদগ্র বিস্ময়ে সকলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেল চেয়ারম্যান।

—আমিই বলেছি কথাগুলো। সমবেত সুধীমণ্ডলী আপনাদের মনের মত কথা বলতে পারবো না বলে খুবই দুঃখিত। কিন্তু সত্য তো চিরকালই সত্য। আর সত্যকে মানার মত সাহসই তো আমাদের একমাত্র সম্বল। আমরা তো আমাদের আলোচ্য পৃথিবীর মানুষের মত বায়োলজিক্যাল ইমপালস্ দিয়ে গড়া নই। তাই কষ্টকর হলেও সত্যকে মানার সাহস নিশ্চয় আছে আমাদের।

—এত ভনিতার প্রয়োজন কি? যা বলতে চাইছেন পরিষ্কার করে বলুন। আদেশের সুরে বলে উঠলো চেয়ারম্যান।

—পরিষ্কার করেই তো বলতে চাইছি চেয়ারম্যান সাহেব। তবে 'নির্মম

সত্য বলার আগে একটু প্রস্তুত করে নিচ্ছিলাম আমার শ্রোতৃমণ্ডলীকে। বেশ, শুনুন তবে। আপনারা নিশ্চয় জানেন যে প্রাণধারণের উপযোগী হবার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে বায়োলজিক্যাল এমব্রায়ো যা জৈব ভ্রূণ নিয়ে গেছিলাম আমরা পৃথিবীর বুকে। নিষ্প্রাণ কুমারী গ্রহে জীবনের সন্ধান জাগানই ছিল আমাদের এক্সপেরিমেন্টের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু পৃথিবীতে চাষ করার হাজার দশেক বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় জৈব ভ্রূণ গুলো। সামান্য একটি ভ্রূণকেও বাঁচাতে পারিনি আমরা।

—না, না…একী অসম্ভব কথা! এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল অনেকে।

বিচিত্র হাসির আভাসও ফুটল না দৈত্যাকার বৃদ্ধ রোবটের মুখে। ভাব-লেশহীন মুখে মৃদু-মৃদু মাথা দোলাল মরচে পড়া রোবট। কেমন যেন ঝিক মিক করে উঠল চোখের আলো।

—উত্তেজিত হয়ে সত্যকে অস্বীকার করা যায় না বন্ধুগণ। আমি যা বললাম তা একান্তই সত্য। আমার ওপরেই ভার ছিল জৈব ভ্রূণ চাষ এবং রক্ষণাবেক্ষণের। এ সম্বন্ধে আমার গোপন রিপোর্ট রয়েছে ন্যাশা-নাল আর্কাইভস ফর কালটিভেসান অফ বায়োলজিক্যাল সিডস্। শুধু কি তাই? মৃত ভ্রূণের বেশ কিছু স্যাম্পেলও সুরক্ষিত আছে ন্যাশানাল ল্যাবরেটারীতে। খুব ধীরে ধীরে কথাগুলো বলল বৃদ্ধ রোবট।

প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটল যেন হলঘরের মধ্যে। বিস্ময়ের আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত গুঞ্জন।

—তাহলে প্রাণের সৃষ্টি হল কি করে পৃথিবীতে? মানুষের উৎপত্তিই বা হল কি করে? অসহায়ের মত প্রশ্ন করল চেয়ারম্যান।

—সঠিক করে কিছু বলতে পারবো না। তবে আমাদের ব্যর্থতায় মজা পেয়ে হয়তো বা অন্য কোন উন্নত সভ্যতা জৈবভ্রূণ বপন করেছিল পৃথিবীতে। এ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছিলাম তখন। হঠাৎ একদিন জলে স্থলে দেখা দিল প্রাণের প্রথম স্পন্দন। অবাক হয়েছিলাম আমি। আবার হয়তো বা কার্বন অণুর বিচিত্র লীলায় কোন এক শুভ মুহূর্তে প্রাণ কণি-কার আবির্ভাব ঘটেছিল পৃথিবীর জলরাশির মধ্যে। কারণ জৈব জীবাণু তো মহাশূন্যে মেঘের আকারে ভেসে বেড়ায় যত্রতত্র। কালক্রমে প্রাকৃতিক কারণে ইভলিউশানের নির্দিষ্ট ধারায় মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে পৃথিবীতে উর্বর জমিতে।

—এতদিন…এত দিন বলেননি কেন আপনি? সত্য গোপন করতে বিন্দু-

মাত্র লজ্জা হল না আপনার। বেশ কিছু ক্রুদ্ধ কণ্ঠের আওয়াজ উঠল সামনের সারি থেকে।

—সত্য যে গোপন আমরা করতে পারি না তা তো ভাল করেই জানেন আপনারা। তবে জাতীয় স্বার্থেই জনসাধারণের কাছে বলা হয় নি এতদিন। এক্সপেরিমেন্টের ওপর নির্ভর করেই এগিয়ে চলেছে আমাদের সভ্যতা। ভুলে যাবেন না আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে গ্রহে গ্রহে জৈব ভ্রূণ চাষের এক্সপেরিমেন্ট করা। এর উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে আমাদের রোবটীয় সাহিত্য সভ্যতা সংস্কৃতি।

মহাশূন্যের নীরবতা নেমে এল হলঘরের মধ্যে। মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল রোবট শ্রোতৃবৃন্দ। কঠিন সত্যকে জানার কষ্ট তো কম নয়। মনোভাবের আদান প্রদান হল শুধু দপদপানিভরা চোখের আলোয়। এক এক করে মুহূর্তগুলো খসে পড়ল মহাকালের বুকে।

অবশেষে নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করল সেই বিদ্রোহী যুবক রোবট।

—আর কোন রহস্য নেই। জলের মত স্বচ্ছ হয়ে গেল সব। লজিক লজিকই……এর ব্যতিক্রম নেই কোনখানে। স্বয়ং সৃষ্ট নই আমরা। এক্সপেরিমেন্টের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে আমাদের। আমাদের নিয়েই এক্সপেরিমেন্ট করছেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা। হয় তো বা দুর্বল ক্ষীণজীবি স্বল্পায়ু ঐ পৃথিবীর মত জৈব কোন প্রাণ। □

টিপু

এটা একটা জেলখানা। বিশেষভাবে সাজানো ঘরের মেঝেতে পুরু কার্পেটপাতা। দামী দামী ফার্নিচার। চামড়া দিয়ে বাঁধানো মোটা মোটা বই আলমারীতে সাজানো রয়েছে। নতুন নতুন আবিষ্কার সংক্রান্ত চমক জাগানো বহু তথ্যের হদিস মিলতে পারে এখানে।

লাইব্রেরী! তবু এটা একটা জেলখানা! টিপু জানে!

ভারী পর্দা ঝুলছে জানলায়। ঘরের বাইরে একমাত্র দরজায় গার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কাঁধে ঝোলানো খাপে ভরা একটা অস্ত্র।

টিপু সব রকম সুযোগ পাওয়া কয়েদি হয়ে রয়েছে ছ'দিন ধরে। ওই সময়ের মধ্যে টিপুর কাছে কয়েকজন ভিজিটর এসেছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই মেডিকেল অফিসার। এসেছিলেন টিপুকে পরীক্ষা করে দেখতে।

ওদিকে টিপু যখন যা চেয়েছে তা পেয়েছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। টিপুর কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখা হয়নি। ওর খাওয়া দাওয়ার দিকে বিশেষভাবেই নজর রাখা হয়েছিল।

না, টিপুর এখানে কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

খাবার প্লেট একপাশে সরিয়ে রেখে টিপু চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। ওই ভাবে কয়েক মিনিট কাটিয়ে ফের বসলো সোজা হয়ে। খাবারের ট্রলির ওপর থেকে ঢেলে নিল এক কাপ কফি। এটা দ্বিতীয়বার!

চিন্তিতভাবে কফির কাপে চুমুক দিতে লাগলো ও।

টিপু বয়সে যুবক। একমাথা ঘন চুল। একটু লম্বাটে ধাঁচের মুখে বুদ্ধির উজ্জ্বল ছাপ। ওর গায়ের ত্বক্ মসৃণ। রঙ একটু ফ্যাকাশে। শরীরের গড়ন বিশেষ শারীরিক শক্তির পরিচয় প্রকাশ করে না। টিপু এমনই একজন মানুষ যাকে পথে বা ভীড়ের মধ্যে দেখেও ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রাহ্য করা যায়। কিন্তু—

হ্যাঁ, কিন্তু! টিপুর চোখদুটোর দিকে যদি কারো নজর পড়ে যায় হঠাৎ, তখনই থমকে যেতে হবে। তখন কিন্তু ওকে অগ্রাহ্য করা সহজ হবে না। টিপুর চোখের তারা দুটো এতই ঘন কালো আর বড় বড় যে মনে হতে পারে চোখই নেই! চোখের জায়গায় রয়েছে গুহাময় দুই গহ্বর, যার ভেতরের অত্যাশ্চর্য অন্ধকার মায়াবী শক্তির মতো আকর্ষণ করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে।

টিপু পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ অসুখী এবং বিরক্ত!

তবু টিপুর পক্ষে এখন মন্দের ভালো! ওকে জেলখানায় আনা হয়েছিল। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল ওর দিকে। টিপু অতিশয় সদয় ব্যবহার পেয়েছে মেডিকেল কমিশনের কাছ থেকে। তা সত্ত্বেও মেডিকেল অফিসারেদের চোখে মুখে একটু আধটুক ভয়ের চিহ্নও টিপুর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। নিঃসঙ্গতাটুকু অন্ততঃ সাময়িক ভাবে ঘুচে গেছে টিপুর।

টিপুর মধ্যে রয়েছে একটা বিশিষ্ট গুণ। তবু অবিশ্বাসীরা ওকে মোটে আমল দিচ্ছিল না। ওর ওই বিস্ময়কর বিশিষ্ট গুণের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দেশের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের মধ্যেও তর্ক বিতর্কের ঝড় তুললো। পরিণামে গঠন করা হলো একটা মেডিকেল কমিশন। টিপুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে।

হতে লাগলো পরীক্ষা। আটঘাট বেঁধে পরিকল্পনা মত।

টিপু নিজেও নিষ্ক্রিয় থাকে নি। কমিশনের সদস্যরা সকলেই অভিজ্ঞ। মাথায় পাকা চুল,অচঞ্চল ভ্রূ আর চশমার আড়ালে উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে টিপু সম্পর্কে ওরা কী রকম ধারণা করছেন সেটা আগেভাগে জানা হয়ে গিয়েছিল। অনুমানে নয়। ওদের মনের ভেতর হাতড়িয়ে জেনে নেওয়া! টিপুর বিশেষ গুণ তো এটাই! কমিশনের সদস্যরা টিপুকে গোড়াতে সহজাত গুণ সম্পন্ন এক পাগল ভেবেছিলেন।

এখনও ওরা কতদূর বিশ্বাস করেন টিপুর কথা? টিপু অবাক হয়ে ভাবে।

ও হাসলো নিজের মনে। পাশে পড়েছিল একখানা খবরের কাগজ। সেটাকে হাতে নিল। এই খবরের কাগজগুলোই টিপুর বন্ধুর কাজ করছে। প্রতিদিন টিপুর এই টেলিপ্যাথিক পাওয়ার সম্পর্কে কতই না গল্প কাহিনী প্রকাশ হচ্ছে এদের পাতায়! সবই অবশ্য সত্য নয়। অতিরঞ্জিত গাঁজাখুরী গল্পও বেরোয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়া মন-জানাজানিমূলক শক্তির পরিচয় জগতে যেন শুধু এই টিপুই দেখাতে পারে! এদের জ্ঞান এখনও কত সীমিত!

যাই হোক এই কাগজওলাদের দৌলতেই টিপু এখন একজন পাবলিক্ ফিগার! টিপুর উদ্দেশ্য সফল। ওর দাবী দাওয়ার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখার জন্যে এখন সরকারী লোক নিযুক্ত হয়েছে।

টিপু হাতের কাগজ খুললো। প্রথম পাতায় ওর ছবি ছাপা হয়েছে। ক্যাপসন: টিপু সম্পর্কে কমিশনের রিপোর্ট আগামীকাল।

নিউজপ্রিন্টের দিকে বেশীক্ষণ তাকালে টিপুর চোখ জ্বালা করে। ফটোর নীচে যে কাহিনী ছাপা হয়েছে, সেটা খুব বেশী বিশ্বাসযোগ্য নয়। খবরে এইরকম একটা ইঙ্গিত—দেশের নিরাপত্তার দিক দিয়ে টিপু সম্পর্কে বিশেষভাবে নাকি চিন্তা করছেন সরকার। ওর এই রোমাঞ্চকর সহজাত ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। কোন সামরিক বিভাগে বা গুপ্তচর মহলে টিপুকে রাখা যায় কিনা, সেটা স্থির করার জন্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ভেবে দেখছেন এখন।

হু: যত্ত সব…খবরের কাগজটা টিপুর হাত থেকে খসে পড়লো মেঝেতে।

দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। ভিজিটর? টিপু দরজার দিকে তাকালো! ডা: সরখেলের মোটাসোটা বেঁটে খাটো মূর্তিটা নজরে এলো। এই ভদ্রলোকই ওকে পরীক্ষা করার কাগজগুলো পরিচালনা করেছিলেন।

ডা: সরখেলের কপালের চামড়ায় এখন ভাঁজ পড়ে রয়েছে। তবু মুখখানা বেশ খুশি খুশি! কী কারণে? টিপু ওঁর মনের ভেতরে ঢুকলো। কিন্তু খুশীর কারণটা আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ বিরক্তিতে গুটিয়ে নিল নিজেকে।

'টিপু' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ডা: সরখেল বললেন, 'তোমার খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। খাওয়াদাওয়ার সময়ে তোমাকে আমি বিরক্ত করতে চাই না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' টিপু বললো, 'আপনি কি একটু কফি খাবেন,

ডক্টর সরখেল?'

'নো থ্যাঙ্কস্।' ডাঃ সরখেল বললেন তাড়াতাড়ি, 'এখন আমি তোমার জন্যে একটা ভাল খবর নিয়ে এসেছি কিন্তু।'

'ও, তাই বুঝি?' টিপু অনুত্তেজিত গলায় বললো, 'খবরটা কী? আমার প্রস্তাবের ওপরে সিদ্ধান্ত নেওয়া কোন কিছু—?'

'ও বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারি না, টিপু। আমি তোমাকে আগে বলেছি, তোমাকে নিয়ে যাঁরা ভাবছেন তাঁরা জানেন তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কী। মেডিকেল কমিশনের রিপোর্টগুলোর সঙ্গে নিত্য যোগা-যোগ রাখছেন শুধু তাঁরাই। তোমার প্রস্তাব তো সুপ্রজনন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কোন একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা? এতে তাঁদের সায় আছে কি নেই, এই তো? সমস্তটা বোধ হয় সরকারের ওপরেই নির্ভর করছে। আমি একজন সামান্য ফিজিসিয়ান।'

বলে, হাসলেন ডাঃ সরখেল।

'তা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু এখানে আমাকে আর কতক্ষণ থাকতে হবে?'

'তোমার জন্যে ভাল খবর বলতে তো আমি সেটাই বুঝি। আমাদের স্টাডি কমপ্লিট্! এখন তোমার ইচ্ছে। যখন খুশি চলে যেতে পারো। তুমি মুক্ত। আজ রাত্রেই! চলে যাবে কি?'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো টিপুর।

'ভেবেছিলাম, খবরটা শুনে তুমি খুশী হবে!' ডাঃ সরখেল বললেন, 'তোমার অবস্থাটা হয়তো একটু জেল-কয়েদির মতো হয়েছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, জায়গাটা অসুবিধাজনক ছিল না মোটেই! আর মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তুমি শুনতে পাবে—'

চমকে উঠলো টিপু। শেষ কথাটা বলবার সময়ে ডাঃ সরখেলের নাড়ির স্বচ্ছন্দগতি হঠাৎ যেন একটু বাধা পেল। হালকাভাবে, ডাক্তারের মনের ভেতরটা হাতড়ে দেখলো টিপু। মনে হলো, ওর অনধিকার প্রবেশে শক্ত-বাধা আসছে ডাঃ সরখেলের দিক থেকে।

'টেলিপ্যাথরূপে তোমার ক্ষমতা সম্পর্কে আর কেউ সন্দেহ করে না অবশ্য। পরীক্ষা-টরীক্ষা করে যুক্তি সহযোগে সেটা এখন প্রমাণিত। সেটা ব্যাখ্যা করার উপযোগী সাজসরঞ্জাম আমাদের হাতে নেই। তুমি নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছো সবকিছু। তবে আমি মনে করি আমাদের ব্রেনওয়েভ্ স্টাডিজ

তোমার খুব কৌতূহল জাগাতে পারে। ইলেকট্রিক্যাল এনার্জীর পরিমাণ এক কথায় বিস্ময়কর। একজন সাধারণ মানুষের ব্রেনসেলের যা ক্ষমতা তোমার তার চেয়ে অনেক—অনেকগুণ বেশী।'

হাতদুটো কোলের ওপরে জড় করে রেখে টিপু বললো, 'ডায়াগ্‌নোসিস্‌ নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার আগ্রহ শক্তিটাকে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, সেই সম্পর্কে।'

'ঠিক তাই। এগ্‌জাক্‌টলী সো!' ডাঃ সরখেল যেন লুফে নিলেন টিপুর কথাটা। নিজের মুখটাকে খুশীতে উজ্জ্বল করে নিয়ে বললেন, 'তোমাকে নিয়ে কাগজপত্রে যে সব লেখা বেরুচ্ছে, সেগুলো তুমি নিশ্চয়ই পড়ে দেখছো। তোমাকে সামরিক গুপ্তচর, বা ওইরকম কোন একটা বিভাগে নিয়োগ করার সম্ভাবনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলেছে এখন জোরদার।'

টিপু বললো, 'তা চলুক, তবে ওসব ব্যাপারে আমার আদৌ কোন কৌতূহল নেই, ডক্টর সরখেল। অপর মানুষের মনের কথা পড়ে নেওয়ার চেয়ে আরও কিছু জড়িয়ে রয়েছে। আরও কিছু—মানে, পরস্পর বোঝাপড়া। আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং। জগতের প্রতিটি মানুষের মধ্যে যদি আমার এই বিশেষ ক্ষমতাটা থাকতো, তাহলে কী হতে পারতো একবার ভেবে দেখেছেন কি?'

ডাঃ সরখেলের অভিজ্ঞ পাকা মাথা একটু একটু করে দুলতে লাগলো। অর্থাৎ, তিনি ভেবে দেখেন নি। টিপু ফের বললো, 'সম্পূর্ণ বদলে যেতো আমাদের এই পৃথিবী। রাতারাতি! এবং পরিবর্তনটা হতো আরও ভালোর দিকে। দেশের খবরের কাগজগুলোকে আমি সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছি। কিন্তু ও বিষয়ের চেয়ে হাল্‌কা দিকটাকে পছন্দ করে নিয়েছে বেশী। তারা শুধু রোমাঞ্চকর আর্টিকল্‌স্‌ লিখছে আমাকে নিয়ে।'

ডাঃ সরখেল শান্তগলায় জবাব দিলেন, 'তার জন্যে তারা সত্যি দায়ী নয়। এই টেলিপ্যাথীর ব্যাপারে অতীতের নজির রয়েছে। তবে তুমি যা দাবী করছো—ওই পরিবর্তনের কথাটা বলছি, আমাদের সকলের কাছেই একেবারে নতুন···অবিশ্বাস্য!'

'আমি এটা করতে পারি,' সহজগলায় বললো টিপু, 'আমার সহজাত ক্ষমতার এটা আর-এক দিক ছাড়া আর কিছু না। এটা স্রেফ একটা সম্মোহক প্রভাব। আমি মানুষের মনের ভেতরে ঢোকার ক্ষমতাটা বাড়িয়ে তুলে, ডক্টর সরখেল, আপনার বা যে কোন মানুষের মনে একটা দৃঢ়বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারি যে আমি টিপু নয়, সম্পূর্ণ অন্য কেউ—অন্য মানুষ।

সম্পূর্ণ অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়েই।'

'যদি তুমি অন্ততঃ একবার সেটা করে দেখিয়ে—'

'না। আমি আপনাদের আগে বলেছি—এখন আমি এটা উপলব্ধি করি যে আমার ও-ধরনের শক্তির পরিচয় মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরা ঠিক হবে না।'

'কেন, ক্ষতিটা কী?'

'সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হবে আমার। জগতের চোখে আমি নিজেকে একজাতের দানব প্রতিপন্ন করে ফেলবো। তাদের কাছে হয়ে পড়বো একটা জঘন্য অমানুষ টাইপের প্রাণী। যাকে আর বিশ্বাস করা উচিত নয়…পুরাণে বর্ণিত দৈত্যদানবদের মতন যাকে নিধন করাই হবে একমাত্র সৎচিন্তা।'

একটা কুৎসিত আবেগের ঢেউ ছুটে এলো ধীর স্থির ডাঃ সরখেলের দিক থেকে। ওঁর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো টিপু।

'ওসব কথা তুমি বাড়িয়ে বলছো।' ডাঃ সরখেল হাল্কা সুরে বললেন, 'আধুনিক মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে ছোট করে দেখছো তুমি। আমরা এখন আর মধ্যযুগের অন্ধকারের মধ্যে হোঁচট খাচ্ছি না, টিপু। আমাদের সম্পর্কে তুমি যা মনে করো, তার চেয়ে অনেক বেশী মেনে নিতে আমরা এখন প্রস্তুত।' বলে, শব্দ করে হাসলেন ডাঃ সরখেল। মোটা চশমার আড়ালে ওঁর চোখে দুটোতে আলোর মতো ঝিলিক্ দেখা গেল।

টিপু বললো, 'আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না।'

আবার কফির কাপ হাতে নিয়ে টিপু আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগলো। সেটাও যেন এখন ডাঃ সরখেলের কাছের পরম উপভোগ্যময় দৃশ্য। হাসি মুখে তিনি টিপুর দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

আর একবার, ডাঃ সরখেলের মনের গতির অস্থিরতা ধরে ফেললো টিপু। ওঁর মনের ভেতরটা আরও হাতড়াতে লাগলো। কিন্তু আসল চিন্তাটাকে এখনও ধরা সম্ভব হলো না। ডাঃ সরখেল বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে সেটাকে টিপুর শক্তির সঙ্গে চ্যালেঞ্জে ভিড়িয়ে দিয়েছেন।

'আমার প্রস্তাব সম্পর্কে কী হলো?' শুধোলো টিপু, 'বিষয়টাতে আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কি?'

'ওটা ঠিক আমার কাজের আওতায় পড়ে না—'

'আমাকে ও কথা বলবেন না, ডক্টর সরখেল। ওটা আপনারই ডিসিসন।

যদি আপনার কমিশন আমার পরামর্শটাকে বাতিল করে, তাহলে সরকারের আসল দপ্তরে সেটাকে আর পৌঁছে দেওয়া হবে না। আমি শুধু আশা করতে পারি তথ্যপ্রমাণের ওপরে নির্ভর করে আপনি বিচার করবেন। সস্তায় নিজের প্রচারের উদ্দেশ্যে যারা সুযোগের সন্ধানে রয়েছে, তাদের কথায় আপনি কোন রকম প্রভাবিত হবেন না।' ডাঃ সরখেলকে এবার কিছুটা বিব্রত বোধ করতে দেখা গেল। আমতা আমতা করে বললেন, 'না—তা হবে কেন? তবে তোমাকেও এটা বুঝতে হবে টিপু, যে তোমার প্রস্তাবটা অস্বাভাবিক। আরও খুব সতর্কভাবে বিচার বিশ্লেষণ না করে তোমার অনুরোধ কাজে রূপান্তরিত করতে গেলে প্রচণ্ড সমালোচনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে–'

'বিচার বিশ্লেষণ,' হাতের কফির কাপ টিপু টেবিলের ওপরে ঠুকে বসিয়ে দিল। রাগে মুখের চেহারা নিমেষে লাল, 'আরও বিচার বিশ্লেষণের কী দরকার, ডক্টর সরখেল? আমি আপনাকে কিছু দিতে বলছি না। আপনাদের কিছু দিতে চাই আমি। এটাই আমার প্রস্তাব। একটা বিশেষ শক্তির ধারাবাহিকতা—ভাইট্যাল ট্যালেন্ট, যদি নির্ভুলভাবে ব্যবহার করা যায়, একদিন এই ঝঞ্ঝাটে জগতে নতুন পরিবর্তন আসতে পারে।'

মুখের চেহারা ফের বদলে গেল। টিপুর গলায় ফুটে উঠল একটা আন্তরিকতার ছাপ।

'শুনুন, ডক্টর সরখেল। আমি প্রকৃতির এক উদ্ভট সৃষ্টি—এটা বুঝি। ঠিক আমার বাবার মতোই। আমরা দু'জনেই এইরকম বিশেষ অস্বাভাবিক গুণ নিয়ে জন্মেছি। কিন্তু আমাদের দু'জনকে একরকমই হতে দেয়নি। দু'রকম হয়ে গেছি! জন্মেছি যখন, মরতেও হবে। তবে এই বিশেষ শক্তিটাকে তো মরতে দেওয়া যায় না। এটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, লালন করার জন্যে কোন এক ধরনের সুপ্রজননসংক্রান্ত সংস্থা নিশ্চয়ই গড়ে তুলতে হবে।'

'প্রশংসার যোগ্য আইডিয়া!' হাসি মুখে বললেন ডাঃ সরখেল, 'আমাকে বিশ্বাস করো, টিপু, সত্যি তুমি ভাল কথা বলেছো। কিন্তু বাস্তবে এটা কী করে সম্ভব হবে—'অসহায়ভাবে শূন্যে হাতের মুদ্রা করলেন।

টিপু উঠে দাঁড়ালো।

'এখান থেকে আমি এখন চলে যেতে চাই।'

'বেশ, ভাল কথা। তবে এই রূপান্তর সম্পর্কে আমার কৌতূহল

মেটাবে না, তুমি এটা স্থির করেই নিয়েছো তাহলে ? তুমি নিশ্চয়ই ভেবে নাওনি যে আমি তোমাকে একটা দানব ছাড়া আর কিছু মনে করি না !'

টিপু ডাঃ সরখেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটু সময় নিয়ে বললো, 'ডাঃ সরখেল, আপনার জন্যে—শুধু আপনার জন্যেই আমার ক্ষমতার একটু নমুনা দেখাতে যাচ্ছি। এতে আপনার একটু কো-অপারেশন দরকার।'

'নিশ্চয়ই পাবে।'

'তাহলে আপনি আপনার মনের ওপরে যে একটা শক্ত বাঁধন দিয়ে রেখেছেন, সেটাকে এখন আল্‌গা করে দিতেই হবে।'

'কথাটা আমি ঠিক বুঝলাম না।'

'নিশ্চয়ই বুঝছেন, স্যার। আমার বিরুদ্ধে আপনি একটা আত্মরক্ষামূলক বেড়া তৈরী করেছেন। কখন থেকে জানেন ?'

জবাবটা ডাঃ সরখেল অবশ্য দিলেন না। টিপুই ফের বললো, 'যখনই আপনি জানতে পেরেছিলেন আমার টেলিপ্যাথিক ট্যালেন্টটা বাজে ভুয়ো জিনিস নয়, একেবারে নির্ভেজাল খাঁটি। যাই হোক, যদি আপনি আমাকে রূপান্তরিত দেখতে চান, তাহলে সেটাকে নিশ্চয়ই মনে ধরে রাখবেন না।'

ডাঃ সরখেলকে একটু সন্দিহান দেখালো। কিন্তু ওঁর কৌতূহল এখন তুঙ্গে।

'ঠিক আছে।' উনি বললেন, 'তোমার কথাই মেনে নিলাম।'

টিপু ঢুকলো ডাঃ সরখেলের মনের ভেতরে—প্রথমে আস্তে আস্তে হাতড়ালো, তারপর আরও জোরের সঙ্গে। ডাঃ সরখেলের মাথার মধ্যে যেসব চিন্তা জড় হয়েছিল, সেগুলোর প্যাটার্ন প্রকাশ হতে লাগলো ধীরে ধীরে :

মৃত্যু······ডাঃ সরখেলের মন বললো······পাঁচ-ছয় দিন, এ্যালুমিনেট্‌ মিথাইকোলিন, খুঁজে পাওয়া যাবে না······কখনও এটা বোঝা যাবে না··· কফি······অপ্রতিরোধনীয় পদ্ধতি···অতীব কার্যকর পরিকল্পনা, সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে······স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু, পাঁচ থেকে ছয়দিন···অতিমানব খতম······জগতের হিতার্থে···মৃত্যু···ভাল কাজ······অভিনন্দনের পাহাড়······

টিপু চোখ বুজলো।

'কী হলো !' শুধলেন ডাঃ সরখেল, 'হোয়াট'স্ রঙ্ ?'

'কিছু না······'

'সন্দেহ জেগেছে ?' ডাঃ সরখেলের মন বললো, 'অসম্ভব……ধরবার উপায় নেই…স্বাদবিহীন…হার্টের অসুখ হবে……অপরিবর্তনীয়…প্রতিষেধক নেই…টিপু…টিপু…পাঁচ থেকে ছয়দিন…মৃত্যু……'

চোখ খুললো টিপু। ওর মুখ থমথমে। বটে! ডক্টর সরখেল, আপনার ভেতরটা পড়ে যা জানা গেল, সেসবই আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখন। টিপু ধারালো দৃষ্টিতে তাকালো ডাঃ সরখেলের চোখের দিকে! উনি যেন যন্ত্রণায় শক্ খেয়ে অস্ফুট চীৎকার করে উঠলেন।

টিপুর মুখে নিজের মুখখানা দেখতে পেলেন ডাঃ সরখেল। সে মুখ হাসছে।

'তুমিই…আমি!' সারা দেহে কাঁপুনি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ সরখেল। ঢোক গিলে বললেন, 'এযে নিখুঁত রূপান্তর। টিপু, আমি তুমি…তুমিই আমি…! না, না। তুমি এটা করো না! এ-জিনিস করো না।'

'কী জিনিস করবো না?' টিপু বললো, গলার স্বর ডাঃ সরখেলের।

'আমি আপনার কোন ক্ষতি করতে চাই না। আমার রূপান্তরিত হওয়াটা একটু দেখতে চেয়েছিলেন। আপনার কথাতেই এ-জিনিস করে দেখালাম, ডক্টর সরখেল। এখন আপনাকে সবাই যেমন দেখে আপনি দেখুন সেইভাবেই নিজেকে।'

'এ-অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার টিপু! চেঞ্জ ব্যাক। ঈশ্বরের দোহাই…'

'আমি আপনাকে অনেক বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারতাম, ডক্টর সরখেল। যেমন ধরুন, আমাকে হত্যা করে নিজেকে ডাঃ সরখেলের পরিচয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম। যদিও আর বেশীদিন নয়……'

'তার মানে? তুমি ঠিক কী বোঝাতে চাও—'

'না, কিছু না।' টিপুকে হঠাৎ যেন কিছুটা উদ্বিগ্ন দেখালো, 'আপনাদের আমি আর কিছু বোঝাতে চাই না।'

ডাঃ সরখেলের গোল মুখটা ঘামে ভেজা। সর্বশরীরে এখনও কাঁপুনি রয়েছে। টিপু ফের মনের ভেতরে সেঁধিয়ে হাতড়ালো। সম্মোহিত ভাবটা ওর ভেঙে যাচ্ছে।

'আপনি খুশী ডক্টর সরখেল?'

ডাঃ সরখেল ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

'হ্যাঁ। এখন তুমি যেতে পারো টিপু।…প্লীজ গো।'

টিপু কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে তাকিয়ে রইলো ওঁর দিকে। তারপর দর-

জার কাছে চলে গেল।

বাইরের গার্ড টিপুকে দেখেই হাসিমুখে বললো, 'চললেন ?'

'হ্যাঁ, গুড্ বাই।'

পথে এসে দাঁড়ালো টিপু। হাওয়ায় যেন আগুনের ছোঁয়া। একটা ছায়া পেলে একটু জিরিয়ে নেওয়া যায়। কিছুদূরে পথের একটা গাছ পাশের বাড়ির রকে ছায়াদান করছে। সেখানে গিয়ে বসলো টিপু। বসে বসে ভাবতে লাগলো।

ডাঃ সরখেলের মনের খবর ওর পড়া হয়ে গেছে। আর কিছু জানতে বাকী নেই। ডাঃ সরখেল সরকারী লোক। পাঁচ থেকে ছ'দিনের মধ্যে টিপুর প্রাণ যাবে।...পাঁচ থেকে ছ'দিন!

ওই ক'টি দিন ও ভাল ভাবে বাঁচবে।

অতঃপর টিপু জানে কী করতে হবে ওকে। ওর কর্তব্য সম্পর্কে ও এতই দৃঢ় নিশ্চিত হলো যে, সবকিছু যেন অগ্রাহ্য করে জোর গলায় বলে উঠলো, 'আমার একজন বংশধর চাই।'

পিউ

মাথার যন্ত্রণা নিয়েই তার ঘুম ভাঙলো। ঘুমঘোরে, একটা অস্বস্তিকর স্বপ্নও দেখছিল। সেই স্বপ্নের স্মৃতিটাও অস্পষ্ট ভাবে রয়ে গেছে।

বিছানার ধারে পা ঝুলিয়ে বসলো সে। মাথার মধ্যে যন্ত্রণা, হাতের আঙুল দিয়ে তাই কপালের দু'পাশটা জোর করে চেপে ধরলো। তবু যেন দপ্‌দপানি থামানো যায় না। সন্দীপকে বলবে একটা মাথাধরার বড়ি দিতে ?

তারপরই মনে পড়লো, পাশের খাটে সন্দীপ নেই।

দু'টো ঘর নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। সে কিচেনে গিয়ে ঢুকলো। নিজের জন্যে বানালো কড়া করে কফি।

জানলা দিয়ে দেখা যায়, বাইরের আবহাওয়া এখন বেশ পরিষ্কার। ঝকঝকে রোদ্দুর। তবু মেজাজটা তার যেন খুশী হতে চায় না। গতরাত্রে সন্দীপের সঙ্গে একটু তর্কাতর্কি হয়েছিল। মনটা এখনও পর্যন্ত তাই উৎপাত করতে চায়।

দরজায় কলিংবেল বাজলো।

ঘড়ির দিকে তাকালো সে। দশটা বেজে তিরিশ মিনিট।

কে আসতে পারে এখন ? দরজা খুলতেই—

'হ্যাল্লো পিউ ?'

সন্দীপ ! স্বামীকে দেখে অবাক সে।

'কিগো, তুমি বাড়ি ফিরে এলে যে ? আমি তো ভেবেছিলাম দিল্লীর পথে তোমার প্লেন এতক্ষণ অনেক দূরে চলে গেছে।'

'কিন্তু আমি ফিরে এলাম।' বলে ভেতরে চলে এলো সন্দীপ। স্ত্রীর চোখের দিকে বারেকের জন্যেও আর তাকালো না।

'বেশ মজার ব্যাপার তো।' পিউ বাঁকা চোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'গতকাল এমন ভাব দেখিয়েছিলে যেন দরকারী কাজগুলো নিয়ে তুমি দিল্লা না গেলে পৃথিবী যে কোন মুহূর্তে রসাতলে তলিয়ে যেতে পারে।'

'আমি স্বীকার করছি, ধারণাটা আমার ভুলই।'

পিউ বললো, 'কফি খাবে কি ? আর এককাপ তাহলে তৈরী করে দি।'

সন্দীপকে চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করতে থাকে পিউ মাঝে মাঝে। কেমন যেন একটু লাজুক লাজুক ভাব দেখা যাচ্ছে। সন্দীপের স্বভাবে এটা যেন নতুন। খাপ্ খায় না ! নাকি ভাবের অন্য অর্থ ! কাল রাত্রে দু'-চারটে বেশ কড়া কথাই বলা হয়ে গিয়েছিল। মাথাটা গরম করে না দিলে সেসব কথা কি মুখ দিয়ে বেরোয় ?

পিউ সন্দীপের জন্যে হঠাৎ দুঃখ বোধ করতে লাগলো। তার একখানা হাত চেপে ধরে বললো, 'আমি দুঃখিত।'

সন্দীপ বেশ সহজ গলায় বললো, 'কিসের জন্যে ?'

'ছোটবড় অনেক খারাপ কথা কাল আমি তোমাকে বলেছিলাম—'

পিউ স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারলো না। নির্বিকার মুখ !

'আমি এখন স্বীকার করছি, সব দোষটা আমারই। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।' বলতে বলতে স্বামীর বুকে মাথা রাখলো পিউ, 'মাত্র ছ'মাসও আমাদের বিয়ে হয়নি। তবু তুমি এত ঘন ঘন আমাকে একা ফেলে রেখে এখানে ওখানে চলে যাও···আমার মনে হয় যেন এখনও পর্যন্ত আমাদের দুজনের পরস্পরকে জেনে ওঠাই হলো না। রাত্রে যখন বললে আজ ভোরে উঠেই তোমার দিল্লী যাওয়ার কথা, শুনেই মাথাটা আমার গরম হয়ে উঠলো, যা নয় তাই বললাম তোমাকে। আমার মাথার ঠিক ছিল না।'

'ঠিক তাই।' সন্দীপ বললো।

'আমি সব সময়ে ভেবেছি যে স্বামী স্ত্রী—মানে, কিছুদিন বাদেই তাড়া পরস্পরকে কে কী ভাবে দেখছে বুঝছে—সেটা প্রকাশ করতে তাদের আর কথার দরকার হয় না। আমার ধারণা আমাদের ভুল সেখানেই। আমরা দু'জনে পরস্পরকে ভাল করে জানি না এখন পর্যন্ত।'

'আমারও মনে হয় তোমার ধারণা ঠিক।' সন্দীপ বললো 'পিউ মুখ তোলো।'

পিউয়ের চোখে হঠাৎ যেন সন্দীপের চোখ আটকে গেল। কেমন যেন শিরশির করে উঠলো পিউয়ের সারা শরীর। ওই চোখ দুটোর ভেতরে যেন একটা নতুন শক্তিকে আবিষ্কার করলো সে। আগে কোনদিন লক্ষ্যও করেনি।

'পিউ!'

'বলো।'

'আজকাল একটা মানুষকে নিয়ে চারপাশে হৈচৈ পড়ে গেছে। কাগজে পত্রে শুধু তারই কথা। তার ছবি ছাপা হচ্ছে। এ-সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?'

'তুমি কি টিপুর কথা বলছো?'

'হ্যাঁ। সে নিজেকে টেলিপ্যাথ বলে দাবী করে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তার সম্পর্কে তো অনেক গল্পই শোনা যাচ্ছে। মানুষের মনের কথা সে নাকি খোলা বইয়ের মতো পড়ে নিতে পারে।'

'না!' সন্দীপ ধারালো গলায় বলে উঠলো, 'অত সহজ কথা ওটা নয়, মানুষের মনের কথা পড়ে নেওয়ার চেয়ে আরও বিশেষ গভীর গুণ টিপুর মধ্যে রয়েছে বলে সে দাবী করে। মানুষ এর আগে কখনও যা করেনি, তাদের পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার পথ করে নিতে পারে ওই বিশেষ গুণটি দিয়ে। ওটা একটা মহৎ শক্তি!'

স্বামীর ভাবভঙ্গী পিউয়ের হাসির খোরাক হয়ে উঠলো। হেসে প্রায় লুটোপুটি খেতে খেতে বললো, 'সত্যি তোমার এ মূর্তিও আমি এর আগে কোনদিন দেখিনি। দারুণ! দারুণ!'

সন্দীপ বললো, 'এমন মেজাজ আমার সহজে প্রকাশ হয় না, পিউ। যাই হোক, কোনদিন আবার দেখার আশা নেই, জেনে রাখো। চলো, আজ সারাদিনের খাওয়াদাওয়া হোটেলেই সারা হবে। ছুটি যখন নিয়েছি—'

'সত্যি !'

এখনও যেন বিশ্বাস হয় না কথাটা! পিউ বড় বড় চোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

সন্দীপ তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে শূন্যে তুলে নিয়ে একবার ঘুরপাক খেয়ে বললো, 'বলছি তো! আজ সারাদিন ধরে শহর তোলপাড় করে রাত্রে ঘরে ফিরবো। কী দেখবে? সিনেমা? থিয়েটার? নাকি শুধু বেড়াবে? খেতে ঢুকবো কোন হোটেলে। যাই হোক, দেরী হয়ে যাচ্ছে। চলো এবার বেরিয়ে পড়ি।'

ওরা দুজনে ওই যে বেরিয়েছিল, ঘরে ফিরে এলো রাত সাড়ে দশটার সময়ে।

পোষাকটোষাক পালটে সোফার ওপরে দুজনে বসলো কিছুক্ষণের জন্যে। সন্দীপের একখানা হাত পিউয়ের শরীরকে বন্দী করে রাখলো। তার কাঁধে পিউয়ের মাথা।

এক সময়ে উঠে দাঁড়ালো সন্দীপ। আলোর সুইচ অফ করে দিল হাত বাড়িয়ে। তারপর পিউকে দুহাত দিয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল সোফা থেকে। হাল্‌কা পল্‌কা শরীর! সন্দীপের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে পিউ অস্ফুটে কী সব বলতে লাগলো।

বেডরুমের দরজার সামনে পৌঁছে দাঁড়াতে হলো। দরজা বন্ধ। খুলে গেল সন্দীপের পায়ের ধাক্কা খেয়ে। ভেতরে ঢুকে পিউকে যত্নের সঙ্গে বিছানার ওপরে সে শুইয়ে দেওয়ার পরই টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো।

'আহঃ! কী উৎপাত!' বিরক্ত হয়ে বললো পিউ।

'বাজুক।' সন্দীপ বললো, 'ওসব গ্রাহ্য করার সময় এটা নয়।'

'কিন্তু, আমার কান যে ঝালাপালা—'

'পিউ।'

পিউ তড়াক করে উঠে বসলো। হাত বাড়াতেই পেয়ে গেল রিসিভারটা।

'হ্যালো,।'

'পিউ? তুমি এখনও পর্যন্ত ঘুমোওনি—?'

'ন্—না···কে আপনি?'

পিউয়ের কানে এলো, 'কে আপনি মানে? আমার গলার স্বর কি তোমার কাছে এতই অচেনা হয়ে গেল, আমি তোমার সন্দীপ। শোনো পিউ,

আমার আজ দিল্লী যাওয়া হয়নি। অন্য কাজে এখনও আটকে রয়েছি। আগামীকাল ভোরে দিল্লী যাবো……'

পাশে দাঁড়িয়ে সন্দীপ, অথচ এসব কী শুনছে পিউ! রিসিভার কান থেকে সরিয়ে পিউ সন্দীপের দিকে সেটাকে এগিয়ে ধরলো। সন্দীপ হাতে নিল সেটা। কানে রাখলো।

'হ্যালো পিউ?' টেলিফোনের ওদিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, 'এখনও আমার ওপরে তুমি রাগ করে আছো নাকি? অন্ততঃ একটা কথা বলো! বলবে না?'

টেলিফোনের রিসিভার ক্রেডেলে চাপলো।

পিউ পুতুলের চোখ নিয়ে বসে। পুতুলের মতো বোবা!

'ভোরবেলা এখান থেকে বেরিয়ে তোমার স্বামী এয়ারপোর্টে গিয়েছিল ঠিকই। সেখানেই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। তোমার সম্পর্কে আমি জানতে পারি। বিশ্বাস করো, এটা জেনে নেবার কারণ ছিল।'

পাগলের মতো চীৎকার করতে সুরু করলো পিউ।

টিপু ওর মনের ভেতরটা হাতড়ে দেখলো। ওর আতঙ্কটাকে দূর করতে হবে। এই আতঙ্ক ওর মগজের ভেতরটা এখন তোলপাড় করে দিচ্ছে। যন্ত্রণায় ছটফট করা রুগীকে ডাক্তার যে ভাবে শান্ত করতে চায় সেইভাবে পিউয়ের মনটাকে নিয়ন্ত্রণ করলো টিপু।

অতঃপর টিপু সেখান থেকে চলে গেল।

চৈ

ক্যাফেটেরিয়ায় ঢুকেছিল দুই বন্ধু। চৈতালী আর দোলা। দোলার আঙুলে একটা দামী আঙটি। সেটার ছোট্ট হীরের ওপরে ক্যাফেটেরিয়ার নরম আলো লেগে চৈতালীর চোখকে মাঝে মাঝে ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল ঝিলিক মেরে!

দোলার আঙটি পরা হাতটা টেনে নিল চৈতালী। আঙটির পাথরটির ওপরে নজর রেখেই ওর মুখখানা হাঁ হয়ে গেল। ওর চোখে বিস্ময়, ঈর্ষা বা অন্য কিছু—কে জানে? দোলা বুঝতে পারলো না।

দোলা খুশী খুশী গলায় বললো, 'জানিস, চৈ, আঙটি নেব না বলে-ছিলাম, তাতে তাপসের কী রাগ! অবশ্য বিয়েটা তো আমাদের হবেই। বলেছি আগে ডাক্তারীটা পাশ করুক—'

দোলার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে চৈ বললো, 'ফাইন্যাল পরীক্ষা তো এগিয়ে এসেছে শুনলাম।'

'আর, তাছাড়া—'

'তাছাড়া?'

জবাব দেবার আগে দোলার মুখে একঝলক্ রক্ত নেচে গেল, 'টাকার দরকার। প্র্যাকটিশ করে আগে কিছু জমিয়ে নিক এটাই আমার ইচ্ছা। হঠাৎ পেটে কেউ—'আবার নতুন করে মুখখানা সিঁদুরে হয়ে উঠলো।

চৈতালী খুশীতে যেন ফেটে পড়লো বন্ধুর ইচ্ছার কথা শুনতে শুনতে। বব্‌ছাঁট, স্যাম্পু করা রেশমী চুলগুলোকে দুহাত দিয়ে চেপে ধরে দরাজ গলায় হেসে উঠলো।

'সত্যি রে দোলা, শুনে সত্যি আমি খুশী হলাম।'

সুখী সুখী ভাব নিয়ে দোলা টেবিলে একটু ঝুঁকে বসলো। চাপা গলায় বললো, 'তুইও তোর মনের মানুষের সন্ধান কর না। আর কতদিন হৈহৈ করে কাটাবি? ওসব রুপোলী পর্দার নায়কদের চিন্তা ছাড়! তোর মুগ্ধ হীরোদের সংখ্যা তো কম নয়! আমাদের বয়সী মেয়েরা—'

'প্লীজ, দোলা।' হাসি মিলিয়ে গেল চৈতালীর মুখ থেকে, 'তাপসকে নিয়ে তুই সুখী হবি, আমি জানি। কিন্তু আমাকে এখনও অপেক্ষা করতেই হবে। যাকে নিয়ে আমি জীবনে সুখী হতে পারবো, তেমন উপযুক্ত মানুষকে আমি দেখতে পাইনি এখনও পর্যন্ত। সোজা কথা!'

'অলকেশ সম্পর্কে তোর ধারণাটা কেমন? ও বেচারা তো দু'বছর ধরে তোর পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুনি।'

'অলকেশ ভাল ছেলে।' চৈতালী সপ্রশংস গলায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল।

'ভাল ছেলে, তবে সিনেমার নায়ক অতনুকুমারের গ্ল্যামার তো তার মধ্যে নেই! তাই না? অলকেশ অতনুকুমার নয়। আমার একটা অনুরোধ, চৈ! ওই অতনুকুমারের ভূত তোর মাথা থেকে নামিয়ে দে! আর দেরী না করে।'

দোলাকে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখা গেল। বললো, 'লক্ষ্য করেছিস কি? সে চলে গেছে?'

'কে চলে গেছে? সে কে?' তাড়াতাড়ি চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে চৈতালী ভুরু কুঁচ্‌কে বললো, 'কার কথা বলছিস রে?'

'ঠিক আমাদের পাশের টেবিলে বসেছিল। তুই আগে লক্ষ্য করিসনি

তাকে? বেশ দেখতে। অতনুকুমারের মতন নয়, ঠিকই। তবে যে কোন মেয়ের নজর টানার মতো আকর্ষণ রয়েছে তার শরীরে।'

'তুই থাম্ দোলা। অতনুকুমারের কাছে আর কেউ…হুঁ!'

'তুই মরেছিস, চৈ। সিনেমা সিনেমা করে তোর আর মাথার ঠিক নেই। ওসব মেকি জিনিস! কবে বুঝবি তুই? বাস্তবে ফিরে আয়। আমাদের সংসারের দিকে চোখ রাখ। তখন দেখবি অতনুকুমারের দলে পড়ে না, অথচ অনেক ভাল ছেলে রয়েছে, যাদের ভেতর থেকে একজন তোর মনের মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে।'

'আচ্ছা, এখন চলিরে, দোলা। তাপসের জন্যে তুই একটু অপেক্ষা করবি তো?'

চমৎকার দাঁত দেখিয়ে হাসলো দোলা। চৈতালী বেরিয়ে এলো ওখান থেকে……

বাড়ির পথে হাঁটছিল। বন্ধুর সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। দোলা যাই বলুক, অতনুকুমারের চিন্তা মন থেকে এত সহজে বিদায় হবে না। খুব কম সময়ের জন্যে হলেও চৈতালী বার দুয়েক কথা বলেছে অতনুকুমারের সঙ্গে। ওকে দেখলেই চিনতে পারবে। সিনেমা পাড়ার যে হলটিতে অতনুকুমারের ছবি দেখানো হচ্ছে সেটারই সামনে দিয়ে বাড়ির পথ ধরলো চৈতালী। ছবিটা দু'বার দেখেছে। আর-একবার যেন হাতছানি দিচ্ছে চৈতালীকে।

গুরু! তোমার জবাব নেই। চৈতালী মনে মনে অতনুকুমারকে স্মরণ করে বললো।

সিনেমাহলের গায়ে অতনুকুমারের একটা ছবিআঁকা। কী দীপ্ত, আকর্ষণীয় ভঙ্গী। বড় বড় চোখ দুটো চৈতালীর দৃষ্টিকে চুম্বকের মতো টেনে রাখতে চায়। চৈতালীকে সামনে দেখেই যেন অতনুকুমারের মুখের হাসিটা আরও জীবন্ত হয়ে উঠলো এখন।

চৈতালীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়লো।

'এই যে, কিছু মনে করবেন না—'

চৈতালী আস্তে আস্তে ঘাড় ফেরালো। দেখলো একজন সুদর্শন যুবককে। যুবকের মুখে একটা চাপা হাসি। যুবককে চৈতালীর চেনা মনে হচ্ছে, অথচ স্পষ্ট করে চিনতে পারছে না এই মুহূর্তে।

'বলুন!'

যুবকটি বললো, 'ছবিটি আপনি দেখেছেন?'

চৈতালী ঘাড় কাত করে জানালো—হ্যাঁ।

যুবক চাপা গলায় বললো, 'আমি—অতনুকুমার।'

'কী? কী বললেন?' চৈতালী নিজের কানকে তো বিশ্বাস করতে পারলোই না, চোখের দৃষ্টিও কি এ মুহূর্তে ঠিক আছে ওর? অ-ত-নু-মা-র! কী বলছেন!

'অবাক হবেন না। আমিই অতনুকুমার। ছদ্মবেশ একটু ধরেছি বিশেষ কারণে। আমার অভিনয়টা এ ছবিতে কেমন হয়েছে, আপনাদের মতো সাধারণ দর্শকের অভিমত জোগাড় করতে বেরিয়েছি। এ ছবির প্রডিউসার আমাকে বলছে, অভিনয়ে নাকি এবার আমি ডুবিয়েছি। আমার কিছু টাকা এখনও পাওনা রয়েছে কিনা। তাই ব্যাটা আমার বদনাম ছড়াতে সুরু করেছে এখন……'

'তাই নাকি?' চৈতালী হঠাৎ ষড়যন্ত্রের গলায় বললো, 'চোর প্রডিউসার! কিন্তু পারবে না। …আচ্ছা, আপনি আমাকে দেখে চিনতে পারছেন না?'

'আপনাকে—? ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ! আগে দেখেছি তো। আসুন আসুন। কাছের ওই রেষ্টুরেন্টটায় গিয়ে বসে কথা বলা যাবে। এখানে যদি আমাকে হঠাৎ কেউ চিনতে পেরে যায়, সর্বনাশ। মুহূর্তে ভীড় জমে শহরের একাংশ একেবারে অচল!'

'আমার নাম চৈতালী। বন্ধু আপনজনেরা ডাকে চৈ বলে।'

'ফাইন।' অতনুকুমার বললো।

রেষ্টুরেন্টের একান্তে বসে চৈতালী আবেগের সঙ্গে বললো, 'এখন যেন মনে হচ্ছে, আমি স্বপ্ন দেখছি।'

'না, না! আমি কী এমন একজন অভিনেতা…আপনার এত প্রশংসা পাবার যোগ্য আমি নই। আর আমি এখন অতনুকুমার নয়!'

তার চোখে চোখ মেলানো চৈতালী। বললো, 'আপনি যাই সাজুন, আসলে অতনুকুমারই তো। কিছুক্ষণ আগে আমি আমার বন্ধু দোলার সঙ্গে আপনার সম্পর্কে গল্পটল্প করছিলাম। তাকে বলছিলাম আপনাকে আমি যে কতটা—'কথা আটকে গেল লজ্জায়।

'এটা আমার এজেন্টের আইডিয়া। সে বুঝতে পেরেছে যে সাধারণ দর্শকের মন থেকে আমার ভাবমূর্তিকে মুছে ফেলবার ষড়যন্ত্র সুরু হয়েছে

প্রডিউসার মহলে। তাই জনসাধারণের মধ্যে মিশে গিয়ে আমার সম্পর্কে তাদের ধারণার কথাটা আমার বুঝে নেওয়া উচিত। তাই আমি নিজে লুকিয়ে আলাপ আলোচনায় নেমেছি এখন। গত কয়েকদিন ধরেই একাজ চলছে।' তার একখানা হাত টেবিলের ওপর দিয়ে গিয়ে চৈতালীর একখানা হাতের ওপরে পড়লো। গাঢ় গলায় বললো 'ইউ আর এ লাভ্‌লি গার্ল, চৈ! কোথায় থাকো?'

চৈতালী যেন স্বপ্নের ঘোরে নিজের বাড়ির ঠিকানা বলে দিল।

ছোট্ট সৌখিন ফ্ল্যাট চৈতালীর। আরামদায়ক সোফায় চৈতালীকে পাশে নিয়ে সে বসেছে।

'আজ পর্যন্ত আমি অনেক মেয়েকে কাছে পেয়েছি, চৈ, তোমার কাছে একথা লুকিয়ে লাভ নেই। কিন্তু তাদের একজনও আমার মনে একটুও দাগ রাখতে পারেনি। তারা কে কী কেমন বেবাক ভুলে গেছি। তার জন্যে অবশ্য আপশোষও নেই। তবে তুমি একেবারে আলাদা! হ্যাঁ, চৈ! আমার জন্যে তুমি বিশেষ। তোমার মতো একজনকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম মনে মনে—

চৈতালীর কোমর তার একহাতের মধ্যে বন্দী হলো।...

সাক্ষী রইলো সময়।

ঘরের দরজায় বাইরে থেকে দুমদাম আওয়াজ। হঠাৎ যেন ডাকাত পড়েছে। দুজনেই চমকে উঠলো।

অবসন্ন শরীরটাকে চৈতালী প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গেল বন্ধ দরজার কাছে। ঝড়াং করে ছিটকিনি নামালো। দরজা খুলেই প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলো, 'আঃ! কে, কী হয়েছে?...ও বিদ্যুৎ, তুমি?'

বিদ্যুতের চোখে চশমা। রোগা ছিপছিপে চেহারা। একমাথা উস্কখুস্ক চুল। মেজাজ রীতিমত চড়া। চৈতালীর ঘরের অতিথিকে প্রথম নজরেই দেখে নিয়েছিল সে। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো ধেয়ে আসবার আগে উদ্দেশ্যটা যেন চোখের ভ্রূকুটিতে ফুটে উঠলো।

দেখে সাবধান হলো চৈতালী। বললো, 'তোমার তো এখন আসবার কথা ছিল না। আমি বলেছিলাম, একটু ব্যস্ত রয়েছি। আমার ঘরে অতিথি—বন্ধু......'

তাকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল অতনুকুমার। বিদ্যুতের চোখের ওপরে চোখ রেখে বললো, 'এক মিনিট। চৈতালী আপনার সঙ্গে কখন কথা

বলেছিল ?'

'প্রায় একঘন্টা আগে। টেলিফোন করে বলেছিল, অতনুকুমার আসছে। তাই একটু ব্যস্ত রয়েছি। শুনে আমি বিশ্বাস করিনি। খবরটা যে মিথ্যে, এখন চোখে দেখে বিশ্বাস করলাম।'

অতনুকুমার চৈতালীর দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললো, 'তোমার বয়ফ্রেণ্ড? তা' ওকে অতনুকুমারের খবরটা তুমি জানিয়েছিলে কেন ?'

চৈতালী বললো, 'আমি চেয়েছিলাম, ও জানুক আমার সঙ্গে সিনেমার জনপ্রিয় নায়কের কত বন্ধুত্ব হয়েছে—'

অতনুকুমারের মুখে রহস্যময় হাসি দেখা দিল। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সে বিদ্যুতের উদ্দেশে বললো, 'চলি ব্রাদার। আমি তোমার কথা জেনে নিয়েছি।'

আস্তে আস্তে চৈতালীর মনের ভেতরে ঢুকলো, হাতড়ালো। তারপর তার মনের আবেগটুকুর জন্যে কৌতুক বোধ হতে লাগলো টিপুর। রূপান্তরিত অতনুকুমার টিপু হয়েই কেটে পড়লো দুই প্রেমিক প্রেমিকার মাঝখান থেকে।

মিতা

বাবার খবরের কাগজ পড়া শেষ। কাগজটাকে ভাঁজ করে রেখে দিচ্ছে। মিতা জানে এবার বাবা একটু কেসে গলা ঝেড়ে নিয়ে বক্তৃতা দেবার ভঙ্গীতে মেয়েকে কিছু শোনাবেই। বাবা একজন সংসদ সদস্য। এখন কোন অধিবেশন নেই। তাই বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাসটুকু বজায় রাখার জন্যে বাবা বাড়িতে বসে বোধ হয় এই কাজটি বেছে নিয়েছে। মিতা মনে মনে একথা ভেবে কৌতুক বোধ করে। বাবাকে মুখ ফুটে অনুমানের কথাটা বলতে পারে না অবশ্য।

ভাল শ্রোতার সব গুণগুলো নিয়ে মিতা বাবার বক্তৃতা শুনে যাবার চেষ্টা চালিয়ে যায় রোজই। এটা এক রকম একটা রুটিনে দাঁড়িয়ে গেছে বলা যায়।

আজ কিন্তু মিতা ওর বাবাকে একটু ফাঁকি দেবার সুযোগ খুঁজছিল। লাইব্রেরীর দরজার দিকে বারবার ছুটে যাচ্ছিল ওর চোখদুটো। একটু যদি বুদ্ধি খাটানো যায়।

কিন্তু মাননীয় সংসদ সদস্য তখন ঘুরে বসেছে মেয়ের দিকে মুখ

করে।

'যত সব জঘন্য ব্যাপার। মিতা, তুমি ওই টিপু নামের অদ্ভুত লোকটার কথা নিশ্চয় শুনেছো। আমাদের দেশের কাগজপত্রগুলো তাকে ভি-আই-পি করে তুলেছে!'

'পাগল! ডাহা পাগল। অবাস্তব কথা বলে—'

'কেউ বিশ্বাস-ও করে না।' মিতা বললো। দুহাত তুলে মাথার চুল ঠিক করতে লাগলো। বাবাকে বোঝাতে চাইলো টিপুর কথা শোনবার আগ্রহ ওর আদৌ নেই।

বাবাকে তবু বলতে শোনা গেল, 'অথচ কাগজের রিপোর্টাররা এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে।'

'তুমি ঠিকই বলছো, বাবা।'

বাবাকে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়তে দেখলো মিতা।

'যাক, তুমি কী ঠিক করেছো? নীলাঞ্জনের সঙ্গে পার্টিতে যাবে, কি যাবে না?'

'মনস্থির করার চেষ্টা করছি—'

'কাগজ দেখতে চাও?'

'না—'

'এটা তোমার দেখা উচিত। আমাদের জগতে ভুরিভুরি কত যে উদ্ভট ঘটনাই না ঘটে চলেছে। আর, তুমি কিনা ওসব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চাও না? আশ্চর্য!'

মিতা হাসি মুখে বাবার দিকে তাকালো।

'বাবা, তোমাদের ভাষায় এসব কি নতুন অভ্যুত্থান?'

'তুমি কী ভাবছো আমি জানি না, মিতা, সবকিছুতেই আমি রাজনীতির গন্ধ পাই না। আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা ঠিক নয়। ওই যে তুমি নতুন অভ্যুত্থানের কথা বললে, ও সম্পর্কে আমি কিন্তু সত্যি সীরিয়াস। আমি মনে করি ওটা দেশের পক্ষে খুবই বিপদের কথা। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ রাজনীতির বাইরের। আমাদের সংসদের ভেতরে বাইরে এ সম্পর্কে জোরালো আলোচনা হওয়া উচিত।'

'ওই নতুন বিদ্রোহীদের একজন কি টিপু?'

'হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আমি কী করে জানবো? সাংবাদিক বৈঠকে আমি কয়েকটা মন্তব্য করেছিলাম। তা শুনে কাগজের

রিপোর্টাররা কিছু গালগল্পের আইডিয়া পেয়েছিল। আজকাল ওই সব আইডিয়ার কথা শোনবার সময় আমাদের নেই। চারদিকে সব রকমের বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে। সেগুলোকে আমাদের বুঝতে হবে, প্রকাশ্যে জানতে হবে। তারা যে ছদ্মবেশই ধরে থাকুক না কেন, আমরা তাদের চিনে রাখবো।'

এত কথার পর আর কাগজটাকে হাতে তুলে না নেওয়াটা ভাল দেখায় না। বাবাকে খুশী করার জন্যে খবরের কাগজের ওপরে চোখ বোলাতে থাকে। দ্বিতীয় পাতায় টিপুর ছবি ছাপা হয়েছে। ফটো দেখতে দেখতে মিতার মনে হলো, টিপুর উজ্জ্বল চোখ দুটোতে হাত রাখলে যেন আসল চোখেরই স্পর্শ পাওয়া যাবে। সেদিকে একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করতে লাগলো মিতা।

মিতার বাবা বললো, 'শুধু টেলিপ্যাথি বিষয়ে টিপুর নিজের দেওয়া বিবৃতিটুকু পড়ে দেখো। কোন রকম একটা সরকারী সংস্থা গড়ে তুলতে চায়। বাঁচিয়ে রাখতে চায় তার শক্তির ধারাবাহিকতা। এই-রকম সব কথা। দেশের সমস্ত মানুষকে সে টেলিপ্যাথিক বানিয়ে তোলবার স্বপ্ন দেখছে! আমরা সবাই তার শক্তি পাবো, আর সকলের মনের মধ্যে আমরা সকলে ঢুকতে পারবো, কার মনে কী আছে, গড়গড় করে পড়ে নেবো সেসব কথা! উদ্ভট! অবাস্তব!'

শুনতে শুনতে মিতা হেসে কুটি কুটি। পেটে খিল ধরে গেল বুঝি। কোমরের কাছে দুহাত দিয়ে চেপে ধরে সে বললো, 'সত্যি...সত্যি মজার কথা!'

'এসবের কোন মানে হয় না। আর, ওই টিপু নামের মানুষটা যা দাবী করছে, তাও সত্যি নয়। তা' প্রমাণ করাতে হলে উপযুক্ত তথ্যাদি তো চাই-ই। আমাদের বন্ধু ডাঃ সরখেল একটা মেডিকেল কমিশনের প্রধান হয়েছে। টিপুকে পরীক্ষা করেছিল। তারা বলে টিপুর মধ্যে নাকি ভেজাল নেই। তবে ওই রকম একটা বিশেষ শক্তি নিয়ে যে-মানুষ নিজে নিজে কোন মতলব ভাঁজে, সে-মানুষ অতি-ভয়ঙ্কর! মনের গোপনীয়তার চেয়ে আর কী দামী জিনিস আছে বলো? তোমার মনের ভেতরে কীসব চিন্তা বাসা বাঁধছে, সেখানে নিঃশব্দে হানা দিয়ে কেউ তা' স্পষ্টভাবে জেনে নিক এটা কি তুমি কখনও বরদাস্ত করতে পারো?'

জবাব দেবার আগে মিতা একটু ভেবে নিল। বললো, 'সবক্ষেত্রে অবশ্যই

নয়।’

তারপর পরনের শাড়িটাড়ি গুছিয়ে নিয়ে বললো, ‘বাবা নীলাঞ্জনের সঙ্গে পার্টিতে যাচ্ছি।’

শুনে খুশীই হলো বাবা। সেটা তার কথার মধ্যে প্রকাশ পেল, ‘আর তাহলে দেরী করা উচিত না। ওদিকে নীলাঞ্জন ভাবছে। বড় ভালো ছেলে রে—’ব্যস্তভাবে চলে গেল সেখান থেকে।

মিতা দরজা খুললো। বেজে উঠলো টেলিফোন। তাই ফের ঘরের মধ্যে এলো মিতা। টেলিফোন ধরলো। নীলাঞ্জন! পার্কভিউ হোটেলে বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে এখন ধৈর্যহারা, তাই এই টেলিফোন।

মিতা প্রায় দৌড়ে এসে ঢুকলো গ্যারেজে। দুখানা গাড়ি। একখানা ওর বাবা ব্যবহার করে। অন্য গাড়িখানা মিতার নিজস্ব। গতবারের জন্মদিনে বাবার কাছ থেকে পাওয়া উপহার।

মিতা নিজে ড্রাইভ করে। ওর গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো পার্কভিউ হোটে-লের পার্কিংস্পেসে।

হোটেলে ওদের দু’জনের নির্দিষ্ট জায়গায় নীলাঞ্জনকে দেখা গেল না। তবে দুটো সীট্ই খালি রয়েছে। মিতা গিয়ে একটি দখল করলো। নীলাঞ্জন কি তাহলে শেষ পর্যন্ত চলে গেছে? হোটেলের একটি বয় ওদের দু’জনকে ভালারকম চেনে। তাকে জিজ্ঞাসা করে মিতা জানতে পারলো, নীলাঞ্জন বসেই ছিল এখানে! মাত্র কিছুক্ষণ আগে তার পরিচিত একটি ছেলের সঙ্গে কীসব আলোচনা করতে করতে এখান থেকে উঠে গেছে।

শুনে মন খারাপ হয়ে গেল মিতার। নীলাঞ্জন নিশ্চয়ই রাগ করেছে। অসহায় দৃষ্টিতে ও পাশের টেবিলের দিকে তাকাতেই একটি যুবক উঠে দাঁড়ালো। মিতার মনে হলো, এতক্ষণ ধরে পাশের টেবিলে বসে যুবকটি গভীর কালো দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিল মিতার দিকে। বয়ের সঙ্গে নীলাঞ্জনকে নিয়ে ওর কথাবার্তা নিশ্চয় কানে গেছে। তাই চোখে চোখে পড়তেই কিছুটা লজ্জায় তাড়াতাড়ি যেন পালিয়ে গেল যুবকটি।

মিতা আরও কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করে শেষে হতাশ হয়ে বেরিয়ে এলো। গাড়ির কাছে এসেই অবাক। আরে, গাড়ির ভেতরে ও কে বসে রয়েছে!

নীলাঞ্জনই তো! অদ্ভুত মানুষ যা হোক! মিতা বেশ রাগ দেখিয়ে বললো, ‘তোমার বুদ্ধি-টুদ্ধি আর কবে বাড়বে? ওদিকে আমি হোটেলের

ভেতরে তোমার জন্যে হা-পিত্যেস করে বসে রয়েছি, আর তুমি কিনা এখানে দিব্যি আরামে বসে বসে সিগারেট ফুঁকছো?'

'আগে বলো তুমি আমার অবস্থায় কথাটা কি ভেবেছিলে?' নীলাঞ্জনের মুখে দুষ্টু হাসি।

ড্রাইভার সীটে বললো মিতা।

'আমি বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম—'

নীলাঞ্জন বললো, 'তুমি তো সেজেই বেরিয়েছো পার্টিতে যাওয়ার জন্যে। আমার এ-পোষাকে তোমার সঙ্গে যাওয়া চলে না। এখন আমার বাড়িতে চলো। পোষাকটোষাক পাল্‌টে নি।'

হোটেল থেকে নীলাঞ্জনের বাড়ির দূরত্ব বেশী নয়। প্রতিবাদ উঠলো না। মিতা ইগ্‌নিশন কী ঘোরালো। গাড়ীতে মাত্র আট দশ মিনিটের পথ। প্রায় নীরবেই সেটা অতিক্রম করে এলো মিতা।

মেনরোডের পাশে সামনে বাগানওলা ছিমছাম ছোটবাড়ি করেছে নীলাঞ্জন। ও নিজে এঞ্জিনীয়র। নিজের বলতে এখনও পর্যন্ত ওর কেউ নেই। তবে এই মিতা এসে নীলাঞ্জনের সংসারের হাল ধরবে শীগগির! কথা এক রকম পাকা।

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নীলাঞ্জন পাগলের মতো প্যান্টজামার পকেট হাতড়াতে সুরু করেছে দেখে মিতা বললো, 'বুঝেছি। বাড়ির চাবি হারিয়ে এসেছো।'

বিব্রত নীলাঞ্জন বললো, 'সত্যি—কোথায় যে ফেললাম চাবিটা...'

মিতা নিজের ব্যাগ খুলে ভেতর থেকে একটা চাবি বের করলো। দরজার তালায় চাবিটা লাগাতে লাগাতে বললো, 'ভাগ্যিস্ একটা বাড়তি চাবি আমাকে আগে থেকে দিয়ে রেখেছিলে! কী যে ভুলো মন হয়েছে তোমার।

ঘরের ভেতরে দুজনে পাশাপাশি বসেছে। কথায় কথায় প্রসঙ্গটা উঠলো।

মিতা বললো, 'নীল, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে?'

'সিওর, এনিথিং।' নীলাঞ্জন উৎসাহ দেখিয়ে বললো।

'একজনকে খুঁজে বের করতে হবে। তাতে আমি তোমারই সাহায্য চাই।'

নীলাঞ্জন শুধলো, 'কে সে?'

মিতা উজ্জ্বলমুখে বললো, 'লোকটার নাম টিপু। তাকে নিয়ে কাগজ

পত্রগুলো হৈ হৈ কাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়েছে, লক্ষ্য করোনি? কিছুদিন হলো আমাদের শহরে এসেছে সে। লোকটার নাকি দারুণ একটা বিশেষগুণ রয়েছে। মাইণ্ড রীডার!'

নীলাঞ্জন মুখে অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গী করলো।

'মাইণ্ড রীডার! তাতে কী হলো?'

মিতা বললো, 'তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই, নীল! শুধু একটি বার।'

'কেন বলো ত? টিপুর সঙ্গে দেখা করবার এত আগ্রহ তোমার হঠাৎ জাগলো কেন?'

'সে কথা আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আমি নিজেই জানি না হয়তো। কিন্তু তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই—'

'আমিই টিপু!'

'কী-ঈ-ঈ-ঈ…?' মিতার বিস্ময় আকাশছোঁয়া।

'আমি নীলাঞ্জন নই, মিতা। আমি টিপু। আমি তোমাকে চিন্তা করতে বাধ্য করেছি আমি নীলাঞ্জন। কারণ, আমি ভেবেছিলাম তোমার মনের ভেতরে আমি কিছু একটা দেখেছি…'

'কী—কী বলছো…'

টিপু মিতার মনের ভেতরে আর হাতড়ালো না। তবে তার মনের সমস্ত ভাবনা চিন্তাকে এ মুহূর্তে যেন একটা খামের মধ্যে ভরে ফেললো।

শূন্য হয়ে গেল মিতার মন। ওকে ঘিরে একটা খাঁ খাঁ করা শূন্যতা অনুভব করতে লাগলো ও। তারই শক্-এ ওর শরীরটা অকস্মাৎ একবার ঝাঁকি দিয়ে উঠলো। মুখ দিয়ে বেরুলো একটা চিল-চীৎকার! বুজে ফেললো চোখের পাতা। হাতদুটো একসঙ্গে এসে জড়ো হলো মুখের ওপরে।…

'আমি দুঃখিত।' টিপু বললো, 'এ কাজ না করে আমার আর উপায় ছিল না। আমি তোমার সঙ্গে কোন চালাকি করতে চাইনি। সময় আমার হাতে এত কম…'

অবসাদ এলো মিতার শরীরে। ক্লান্ত গলায় বললো, 'তুমি তাহলে পার্কভিউ হোটেলেই আমার পাশের টেবিলে বসেছিলে—'

'ঠিক তাই! আমি যখনই বুঝতে পারলাম নীলাঞ্জন হঠাৎ একটা অন্য কাজে ব্যস্ত রয়েছে, তোমার সঙ্গে শীগগির তার দেখা হবে না, তখন

আমি তোমার মন আমাকে নীলাঞ্জন বলে মেনে নিল। এখন তোমার কাছে আমি স্বীকার করছি, আমি চেয়েছিলাম তোমার বাবাকে একটা উচিত শিক্ষা দিতে। সুযোগ খুঁজছিলাম। কেন জানো? তোমার বাবা আমাকে আদৌ স্বীকার করে না। তাই হঠাৎ আমার মাথায় এলো, ওর মেয়ে তো আমার ক্ষমতাকে মেনে নিতে পারে। স্বীকার করতে পারে। ...কিন্তু আমার সঙ্গে তুমি দেখা করতে এতটা আগ্রহী কেন হয়েছিলে, একটু অবাক হয়ে তাই ভাবছি।'

'আমি জানি না।' মিতা অন্যদিকে তাকিয়ে বললো, 'শুধু আমি তোমাকে খুঁজে বের করতে চেয়েছিলাম, দুটো কথা বলতে চেয়েছিলাম তোমার সঙ্গে। কাগজে তোমার ছবি ছাপা হচ্ছে! দেখেছি! তোমার কথা লেখা হচ্ছে প্রতিদিন পড়ছি!'

'এবং যা পড়ছো, তা থেকে তোমার ধারণা কী?'

'সঠিক কোন ধারণায় আসতে পারিনি। তবে ভাবিয়ে তুলেছিল ঠিকই। তুমি বলেছো, সে সব কথা কেমন যেন ধাঁধার মতো লাগে। সেইজন্যে আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম মনে মনে। তুমি আমাকে তোমার সব কথা বুঝিয়ে দেবে যা এতদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় বলে আসছো, তারও বাইরে আরও কিছু আছে কিনা জেনে নেব আমি, এই আশা।'

'আমিও নিজেকে এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে জানি না, মিতা।' টিপু মিতার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল। মিতা আপত্তি জানালো না। ওর মাথাটা আস্তে আস্তে আশ্রয় নিল টিপুর বুকের ওপর।

'তুমি একটা বিস্ময়! টিপু, তোমার ওই চোখের দৃষ্টিতে...'

'আমি একজন প্রতারক।'

'না! তুমি আমার মনের কথা পরিষ্কারভাবে এখন পড়ে নিচ্ছ...'

'হ্যাঁ, মিতা!' টিপু বললো, 'আমার শক্তিকে বাঁচিয়ে রেখে যেতে হবে—'

ডাঃ সরখেল

একখানা ট্যাক্সি এসে থামলো হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে।

ট্যাক্সি থেকে নামলেন ডাঃ সরখেল। বেশ একটু খুশী খুশী ভাব। পাশে দুটো কৃষ্ণচূড়া গাছে অঢেল ফুলের বাহার। সে দিকে একনজর তাকিয়ে

ডাঃ সরখেল স্থির হয়ে দাঁড়ালেন।

প্রিয় বন্ধু সংসদ্-সদস্যের বিশেষ আহ্বানে দৌড়ে এসেছেন। অতি আনন্দের খবর আছে একটা। বন্ধু আজ প্রথম নাতির মুখ দেখেছে।

ম্যাটারনিটি ফ্লোরে ডাঃ সরখেলকে অনেকেই চিনতে পারলো। তাঁকে নানা দিক থেকে সম্ভ্রম জানানো হলো। সংসদ-সদস্য বন্ধু অবশ্য এগিয়ে এসেছিল সকলের আগেই।

'তুমি এসেছো, অত্যন্ত খুশী হলাম, ডাক্তার। এসো—এসো…,' বলে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুদর্শন যুবককে দেখিয়ে বললো, 'এই তো আমার জামাই!'

জামাই ডাঃ সরখেলের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করলো।

'কনগ্র্যাচুলেসনস্! বেবী নিশ্চয়ই তোমার মতো স্বাস্থ্য পেয়েছে?'

জামাই লাজুক লাজুকভাবে হেসে সেখান থেকে যেতে যেতে জবাব দিল, 'আমি এখনও পর্যন্ত দেখবার সুযোগ পাইনি…'

ডাঃ সরখেল বন্ধুকে শুধোলেন, 'মিতা-মা কেমন আছে?'

'ভালই। সামান্য কাহিল দেখাচ্ছে, তবে ওটা স্বাভাবিক এ মুহূর্তে। আমাদের আর মিনিট পাঁচেক বাইরে অপেক্ষা করতে বলে গেছে। তারপর আমার দাদুভাইয়ের মুখ দেখবার সৌভাগ্য হবে ডাক্তার। যতক্ষণ পর্যন্ত না দেখতে পাচ্ছি, ততক্ষণ মনের অবস্থাটা আমার……'

বলেই থেমে গেল সংসদ-সদস্য। মনে জেগে উঠলো টিপুর কথা। তার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে সে মনের সঠিক অবস্থাটা আঁচ করতে পারতো নিখুঁতভাবে। বোগাস! মনে মনে হাসলো সংসদ-সদস্য। ঘনিষ্ঠভাবে সরে গেল ডাঃ সরখেলের কাছে।

'ডাক্তার, তোমার সঙ্গে আমার আরও কিছু কথা রয়েছে। অবশ্য তেমন কিছু বিশেষ ব্যাপার নয়। তোমাদের ওই টিপুর ব্যাপারটা। টিপুর মৃত্যু হয়েছে—তা' প্রায় দশ এগারো মাস হয়ে গেল। তবু তার কথাটা মাঝে মাঝেই মনে পড়ে যায়। তার দেওয়া প্রস্তাবটির কথাও ভুলতে পারছি কৈ! ইসুটা এখনও পর্যন্ত সংসদের সভায় ঝোলানো রয়েছে। তর্ক বিতর্কের ঝড় উঠছে শুধু মাঝে মাঝে। আমার মনে হয় মেডিকেল কমি-শনের রিপোর্ট প্রকাশ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও বিষয়টারও ইতি করে দেওয়াই মঙ্গল!'

ডাঃ সরখেল বললেন, 'আমার কোঅপারেশন তুমি সব সময়ে পাবে।

সংসদে তুমি প্রস্তাবটা তোলো। পেছনে থেকে আমি সাহায্য করবো।'

প্রসঙ্গ পাল্‌টে গেল। নবজাতকের কথা মনে উদয় হলো ওদের। গর্বিত সংসদ-সদস্য ব্যস্তভাবে বললো, 'চলো, ডাক্তার, আমার দাদুভাইকে আগে একনজর দেখে আসি।'

নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো ওরা।

নব-জাতকের মুখের দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ সরখেলের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্‌য়ের মতো একটা শিহরণ বয়ে গেল! এ শিশুর মুখ সম্পূর্ণ অসাধারণ! কালো, প্রায় পরিণত দুই চোখের দৃষ্টি। চেহারায় এসেছে ঠিক কার আদল? বাবার, নাকি মায়ের? কিন্তু শিশুর মুখ—!

বারবার অনুসন্ধানী চোখে ডাঃ সরখেল নবজাতকের মুখে কী যেন খুঁজতে লাগলেন। বারবারই ওঁর মনের ভেতরে একটা কুচিন্তা জট্‌ পাকাতে লাগলো। একী সত্যি, না একটা দুঃস্বপ্ন? শেষে পাশে দাঁড়ানো বন্ধুর কথায় সম্বিত ফিরে এলো ডাঃ সরখেলের।

'কী ডাক্তার, আমার দাদুভাইকে তুমি কেমন দেখছো বলো তো! দেখো, দেখো—চোখ মুখ হয়েছে দেখছো, একেবারে চতুরের শিরোমণি হয়েই যেন পা বাড়িয়েছে আমাদের সংসারে। লাভ্‌লি!'

'হ্যাঁ, ভেরী লাভ্‌লি!' ডাঃ সরখেল আস্তে আস্তে নীচু গলায় বললেন কথাটা।

'দাদুভাই আমার মিতা-মার শরীর পেয়েছে, ডাক্তার। তুমি কেমন দেখছো?'

ডাঃ সরখেল তো বারবার দেখছেন, আর বারবার ওর শিড়দাঁড়া বেয়ে ওঠানামা করছে এক অদৃশ্য বরফের স্রোত।

নবজাতকের মাথায় কোঁকড়ানো চুল। গাঢ় কালো। ঘুম নামছে চোখে। দুই চোখের পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো পরিণত চোখের অসম্ভব এক উজ্জ্বল বিজ্ঞ দৃষ্টি!

শিশুর মুখের আদলে ডাঃ সরখেল বিশেষ একজনকে দেখতে পাচ্ছেন। অথচ মুখে তার নামটা বারেকের জন্যেও উচ্চারণ করতে পারলেন না! অদূর অতীত থেকে যেন ওঁর কানের কাছে সেই মুখ গুঞ্জন করে বলতে লাগলো: আমার বংশধর চাই। বংশধর!

পাশের দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলাতে লাগলেন ডাঃ সরখেল! □

পাতালকন্যা

মনোজ বসু

হরিপ্রসন্ন আমার বাল্যবন্ধু। দায়ে পড়ে তার চাকরি নিয়েছি। তবে সে লোক ভাল। আমি কর্মচারী, সে মনিব—বাইরের লোক আপনারা কোনক্রমে বুঝতে পারবেন না। যেন বন্ধুই আমি, খাতিরে তার কাজকর্ম করে দিই। মাসান্তে হঠাৎ একদিন খানকয়েক নোট আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে চট করে সরে পড়ে। এই হল মাইনে দেওয়ার প্রক্রিয়া।

সুন্দরবন অঞ্চলে হরিপ্রসন্নর অনেকগুলো চক। নতুন আইন পাশ হল, এবারে জমিদারি গুটিয়ে নেবার পালা। কতক বা বেনামি করে, আর কতকটা জায়গায় বাগান-পুকুর ইত্যাদি বানিয়ে তড়িঘড়ি যতদূর বের করে নেওয়া যায়। এরই তোড়জোড়ে আজকাল বাদাবনে তার ঘন-ঘন যাতায়াত।

একবার আমায় বলল, যাবি ?

অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নয়, যেতেই হবে। রুবিকে নিয়ে মুশকিল—কার কাছে রেখে যাই ? দুর্ভাগা মেয়ে, ছ'মাস বয়সে মা হারিয়েছে, আমিই মা-বাপ দুই হয়ে দেখাশুনা করি। খুড়িমা সম্পর্কের একজনকে অনেক বলেকয়ে এবং নগদ কুড়িটাকা হাতে দিয়ে দশ দিনের কড়ারে মেয়েটাকে গছিয়ে রওনা হলাম।

বৈশাখ মাস। যা গরম পড়েছে—গাঙে খালে কয়েকটা দিন তোফা হাওয়া খেয়ে বেড়ানো যাচ্ছে। এটা উপরি লাভ। সুন্দরবন শুনে ভাববেন না বনজঙ্গলই শুধু। জঙ্গল তো বটেই—হঠাৎ তার মধ্যে দেখবেন, পঙ্খের কাজ-করা প্রায়-অভগ্ন পাকা কুঠুরি—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কোন অনুচর বানিয়েছিল। হয়তো রয়্যাল-বেঙ্গল-টাইগার ইদানীং মহানন্দে বিনা-ভাড়ায় তথায় সগোষ্ঠী বসতি করছে। কখনো বা নজরে পড়বে অনেকটা ফাঁকা

জায়গা—হাসিল হয়ে সেখানটা আবাদ হচ্ছে। কিংবা নদী-খালের ধারে দেখতে পাবেন ছোটখাটো দিব্যি একটা গ্রাম। কাছাকাছি বনকর-অফিস, তাকে ঘিরে মানুষ ঘরবাড়ি তুলছে। অথবা গ্রামের মতন দেখেই সরকারি অফিস বসিয়েছে সেই জায়গায়। নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন না—স্বচক্ষে দেখে আসুন, কতটুকুই বা পথ আপনাদের জায়গা থেকে!

প্রথম আমরা শিবনগর কাছারিবাড়ি উঠলাম। নায়েবের সঙ্গে সেহা-কড়চা রোকড়-খতিয়ান নিয়ে বিষম আয়োজনে হিসাবপত্তর চলেছে। কিন্তু জানি তো হরিপ্রসন্নকে! ছটফটে স্বভাবের মানুষ—দিন চারেক পরে বিরাট কড়চা-খাতা সশব্দে বন্ধ করে বলল, এদিকে ভালই হচ্ছে নায়েবমশায়, হাঁসখালি-চকের কী গতিক একবার দেখে আসা দরকার। ভাতে-ভাত চাপিয়ে দিতে বলুন—এই ভাঁটায় বেরিয়ে পড়ব।

এই হাঁসখালি যাওয়ার পথেই কাণ্ডটা ঘটল। কুক্ষণের যাত্রা—বাপ-ঠাকুর্দার পুণ্যে প্রাণে বেঁচে এসেছি। কিংবা বলব, পরম লগ্নে বেরিয়েছিলাম—ভাবতে আজও রোমাঞ্চ লাগে। বলছি, বলছি—অত তাড়াবেন না। বলবার জন্যে তো আসর সাজিয়ে বসলাম।

দুপুরবেলা আমাদের পানসি এক পাশখালি দিয়ে যাচ্ছে। গোটা দুই বাঁক পার হতে পারলে বড়-গাঙ। হরিপ্রসন্ন থামতে ইশারা করল মাঝিকে! হামেশাই জঙ্গলে আসে, ঝানু শিকারি—আমরা চতুর্দিকে নিঝুম নিঃসাড় দেখছি, সে তার মধ্যে জন্তু-জানোয়ারের চলাচল টের পেয়েছে।

পানসি এক হেঁতাল-ঝোপের আড়ালে নিয়ে রাখল। পনের-বিশ মিনিট যায়, বন্দুকে টোটা ভরে হরিপ্রসন্ন জঙ্গলের দিকে তাক করে আছে। তার পরে দুড়ুম দুড়ুম। হরিণ পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও লাফিয়ে পড়ে জঙ্গলে। এ রকম যাওয়া ঠিক নয়—কিন্তু স্ফূর্তির চোটে বাদার রীতিনিয়ম ভুলে গেছে।

টানাটানি করে শিকার তো নৌকোয় তুলেছে—বাঁকের মুখে এমন সময় মোটর লঞ্চ। শিকারের লাইসেন্স নেওয়া নেই, তার উপরে মাদি হরিণ পড়েছে—হেন অবস্থায় বনকরের সামনে পড়া আর বাঘের মুখে পড়া একই কথা। হরিপ্রসন্ন তা বলে ঘাবড়ায় না। যেন ওদেরই প্রতীক্ষায় ছিল। সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল: বড্ড বাঁচিয়ে দিলেন মশায়রা। নয়ত নৌকো নিয়ে বেগোন ঠেলতে হত আপনাদের অফিস অবধি। ফিস্টি হবে—

দাড়িওয়ালা সেই লোকটা আছে তো, সেই যে আহামরি মাংস রাঁধে? হরিণটা লঞ্চে তুলে দাও হে—

হরিণ তোলবার আগে নিজেই উঠে পড়েছে। আমাদের হাঁক দিয়ে বলে, বড়-গাঙে বেরিয়ে বিষখালির মোহানায় চাপান দিয়ে থাকগে। নিঃশ্বেস ফেলব না, তোমাদেরও ফিস্টি—রাঁধা মাংস নিয়ে আসব। শুধু উনুনে চাট্টি ভাত চাপিয়ে রেখ, ব্যস!

সে হল দুপুর বেলার কথা। এক পহর রাত হয়ে গেল, পেটের ভিতর বাপান্ত করছে। দেখা নেই কারো—না হরিপ্রসন্ন, না তার আহা-মরি মাংস। সারাদিন বড্ড ধকল গেছে, পাশখালিতে জল ছিল না—কাদায় নেমে তিনচার মাইল নৌকো ঠেলেছি। মাঝি মাল্লারা সন্ধ্যে থেকে নাক ডাকাচ্ছে। একা বসে বসে আমিও কখন শুয়ে পড়েছি—একদম কিচ্ছু জানি নে।

পানসি হেলছে দুলছে—ঘুমের মধ্যে এক সময় টের পেলাম। অর্থাৎ জোয়ার এসে গেছে। বাচ্চাকে দোলনায় চাপিয়ে মা যেমন দোলা দেন, ঠিক তেমনি। মন্দ লাগে না। খানিক এমনি গেল। ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন দেখছি—

হঠাৎ মাঝি চেঁচিয়ে ওঠে: সর্বনাশ হয়েছে—নৌকো বানচাল!

লাফিয়ে উঠে বসে আতঙ্কে থরথর কাঁপি। জোয়ারের টানে কাছি ছিঁড়ে নৌকো তীরের মতন ছুটেছে। নোনা জলের তরঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে সাদা দাঁত মেলে হাসছে খলখল শব্দে। যা অবস্থা, সবসুদ্ধ এতক্ষণ জলতলে যাই নি—সেই তো আশ্চর্য!

মাঝি হাল চেপে ধরে সামলাতে গেল তো মড়াৎ করে হাল দুই খণ্ড! চরমক্ষণের আর অল্পই বাকি। হাত-পা কোল করে সময়টুকু কাটিয়ে দাও—কোন-কিছুই করার নেই। জলের কল্লোলধ্বনি আমার রুবির কান্নার মতই লাগছে। করাল অন্ধকারের পার থেকে রুবির কান্না ভরা ডাক শুনি যেন: বাবা গো, ও বাবা—

ঘন অন্ধকারে কোন জায়গায় কী অবস্থার মধ্যে ছুটছি, বোঝবার জো নেই। পাগলা হাতির মত মাথা নাড়তে নাড়তে নৌকো হঠাৎ গতি বন্ধ করে দাঁড়াল। পাড়ে লেগেছে, লতাপাতায় আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়ে কাছি বাঁধার মত হয়েছে। এমন তো হয় না—বেঁচে গেলাম নাকি? টেমি জেলে চৌখুপি-লণ্ঠনের মধ্যে পুরে উঁচু করে ধরলাম। দুটো উদ্দেশ্য—কোথায় কি ভাবে আটকে আছি, তার কিছু হদিশ পাওয়া। আর জায়গাটা যদি গরম

অর্থাৎ ব্যাঘ্রসঙ্কুল হয়, আলো ধরে জানোয়ারদের ভয় দেখানো।

মস্ত এ বাঁকের মাঝামাঝি কি গতিকে কিনারায় এসে পড়েছি! যে জোরে আসছিল, পাড়ে ধাক্কা খেয়ে পানসির কুচি কুচি হয়ে যাবার কথা। কিন্তু বুনো-লতা জালের মতো আটকে ধরল। বিধাতাপুরুষ আমাদের বেমক্কা পরমায়ু দিয়েছেন। এই থেকে বোঝা যাচ্ছে।

গাঙের পাশাপাশি দীর্ঘ বিসর্পিল এক বস্তু—বাঁধ বলে তো মনে হচ্ছে। আরে, মানুষ কথা বলছে। মানবেলায় এসে পড়েছি তবে তো!

স্ফূর্তিতে নেমে পড়লাম। বিস্তর গোলঝাড়—সেগুলো পার হয়েই বাঁধ। বড় বড় কেওড়া গাছ জায়গাটায় আঁধার জমিয়ে তুলেছে। বাঁধের ওধারটা একেবারে ফাঁকা। মেঠো-জমি ভেঙে হন হন করে কারা আসছে, গুনতিতে পনের-বিশ জন। বিলের মুক্ত বাতাসে ওদেরই কথাবার্তা কানে গিয়েছিল।

এসেই ধমক দিয়ে ওঠে আমার উপর: আচ্ছা মানুষ! আবাটায় নেমে পড়ে লণ্ঠন দেখাচ্ছ। সন্ধে থেকে আমরা হা-পিত্যেশ পথ তাকিয়ে আছি। এস, চলে এস—

কোথায়?

পালোয়ান গোছের একব্যক্তি হুঙ্কার দিয়ে উঠল: কোথায় যেন জানেন না! আকাশ থেকে পড়লেন।

আকাশ থেকে পড়ি নি, জোয়ারের টানে এসে পড়েছি। সত্যিই আমি কিছু জানি নে। থাক্ থাক্। জাত-যাওয়া কাণ্ড—বাতুপুরে উনি এখন রঙ্গরস শুরু করলেন।

হাত ধরল। উঃ উঃ—হাড় যেন গুঁড়ো হয়ে যায়। লোকটা হাত ছেড়ে দিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বলে, ননীর পুতুল! গুটিগুটি অমন পা ফেললে চলবে না। জোর কদমে চল। লগ্নের আর দেরী নেই।

পাকা-গোঁফ এক প্রবীণ মানুষ এগিয়ে এসে হাতের লাঠিটা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। ভাল মানুষ তিনি, কোমল কণ্ঠে বললেন, তোমার লণ্ঠনটা আমার হাতে দাও দাদাভাই। অজানা পথ—লাঠি ধরে সাবধানে আমাদের সঙ্গে এস।

চোখ রগড়ে পরখ করি, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছি না তো? সকাতরে বললাম, লগ্ন—কিসের লগ্ন? বুঝতে পারছি নে, কেন যেতে হবে আপনাদের সঙ্গে?

হেসে উঠলেন সেই প্রবীণ মানুষটি: ও রামশরণ, শোন, শোন— নাতজামাই কেন আমাদের সঙ্গে যাবে বুঝতে পারছে না। তুনিয়ার এত মুলুক থাকতে শোলাদানায় কেন এসে পড়ে, তাও বোধহয় জানে না।

হো-হো হা-হা বহু কণ্ঠে উচ্ছল হাসির ধ্বনি। একজন বলল, মশাল-গুলো ধরিয়ে ফেল হে! ভূতপ্রেতের মতন গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছ, বর ভয় পেয়ে যাচ্ছে।

আমার সেই লণ্ঠন খুলে একে একে টেমিতে মশাল ধরিয়ে নিল। হু-হু করে হাওয়া দিচ্ছে, মশালের আলো কাঁপছে কালো কালো মূর্তিগুলোর উপর।

প্রবীণ লোকটি বললেন, আগে পিছে মশাল ধর। মেঠো-পথ—হোঁচট না খায়। নাতজামাই হাঁটিয়ে নিয়ে বাড়ি তুলতে হচ্ছে। তোমারই দোষ দাদাভাই। ষোল বেহারার পালকি ঘাটে বসে আছে এখনো। খবরা-খবর করে তাদের নিয়ে আসবার সময় নেই। উঃ, যা কষ্টটা দিয়েছ! বসে বসে বিরক্ত হয়ে শেষটা ওরা বলল গাঙের কিনারা ধরে এগিয়ে দেখা যাক। তাই তো তোমায় পেয়ে গেলাম।

মাঠে নেমে পড়েছি এখন। থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, নৌকোর ওদের যে কিছু বলা হল না—

যা বলবার আমরা বলব। যেতে বলা হচ্ছে, তাই চল না তাড়াতাড়ি।

অধিক তর্ক করার তাগত নেই। একটি বার হাত ধরেছিল তার জলুনি থামে নি এখনো। রহস্যময় লোকগুলো আমায় ঘিরে নিয়ে চলল। কোথাও খানাখন্দ, কোথাও বা ধান কেটে নেওয়া জমির উপর দিয়ে চলেছি। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই—দম দেওয়া এক কলের পুতুল হয়ে চলেছি।

অবশেষে পাড়ার মধ্যে এসে পড়লাম। তেমাথা পথের উপর তেঁতুলগাছ। অদূরে বাড়ির উঠানে সামিয়ানা খাটানো। বিস্তর লোকের আনাগোনা। অকুস্থলে পৌঁছে গেছি।

বর নিয়ে এসেছি—

অমান ঢাক ঢোল কাঁসি সানাই বেজে উঠল কোনদিক থেকে। উলু দিচ্ছে মেয়েরা, শাঁক বাজাচ্ছে। মাঠের দিককার আকাশে শোঁ শোঁ করে হাউই উঠে তারা কাটছে।

কন্যাপক্ষ অবস্থাপন্ন। বিয়ের আসর খাসা সাজিয়েছে। কাঁচের হাঁড়ি ঝোলানো সারি সারি বাতি জ্বেলে দিয়েছে। রুপো-বাঁধানো হুঁকোগুলো

লোকের হাতে হাতে ঘুরছে—হুঁকোদানের ওপর বড় একটা বসতে পায় না। গোলাপজল ছিটোচ্ছে ঘন ঘন।

পুরুত তৈরি হয়ে আছেন। উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি আর এক দফা বকতে লাগলেন : ছি-ছি বড্ড ছেলেমানুষ! একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে তোমাদের। জাত মারবার জো করেছিলে। আর দেরি কোরো না, বরাসনে বসে পড়।

আত্মাভিমান হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। রুবির মুখ ভেসে উঠল মনের ওপর। মৃত্যু পথযাত্রিনী রুবির মার বাচ্চা মেয়েটাকে সেই আমার কোলে তুলে দেওয়া।

মারুন কাটুন, যা ইচ্ছে করুন—কিছুতে আমি আসনে বসছি নে। গায়ের জোরে বিয়ে দেবেন নাকি?

এক উঠোন লোকের মধ্যে কেউ চটে না। হাসে, যেন ভারি এক মজার ব্যাপার।

শোন শোন—গায়ের জোরে বিয়ে দেবে নাকি! বর বলছে এই কথা।

আর একজন বলে উঠল, উপোস করে আছে। তার উপর এ-ঘাট ও-ঘাট করে মাথা বিগড়ে গেছে। আসনে বসিয়ে হাওয়া কর, ঠিক হয়ে যাবে।

সেই নিশিরাত্রে বনের প্রান্তে বাতির অনুজ্জ্বল আলোয় বিচিত্র জন সমাবেশের মধ্যে আমি যেন আর এক মানুষ হয়ে যাচ্ছি। অতীত ধুয়ে মুছে প্রায় নিশ্চিহ্ন। শহরের পিচঢালা রাস্তা, পাঁচতলা, সাততলা বাড়ি, সিনেমা, থিয়েটার ট্রামগাড়ি-মোটরগাড়ি—সমস্ত বুঝি মনের আজগুবি কল্পনা! স্বপ্ন দেখছিলাম নাকি এতক্ষণ—স্বপ্নের ঘোরে এক লহমায় যেন জীবনের তিরিশটা বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন বিষম হাসি পাচ্ছে কলকাতা শহর ইত্যাদি হাস্যকর হাস্যকর অবাস্তব কতকগুলো জায়গার কথা ভেবে।

শুভদৃষ্টি। চৌকির উপর দাঁড়িয়েছি টোপরে চাদর ঢাকা দিয়ে। পিঁড়ির উপর কনে বসিয়ে সাতপাক ঘোরাচ্ছে। চোখ নিচু হয়ে আছে আমার। চোখ মেলে বউ দেখব ওর চেয়ে বেহায়াপনা আর কি হতে পারে! বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করছে। দেখন সরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। সরার মধ্যে নানা রকম বাজির মশলা জ্বালিয়ে দিলে চারিদিক যেন দিনমান হয়ে যায়। শুভদৃষ্টির সময় জ্বালে এইগুলো। সরা জ্বালিয়ে পাকা থেকে বলছে, চোখ মেল—চোখ মেল গো! শুভক্ষণে চার চোখের মিলন হবে, তবেই তো আমোদ আহ্লাদে কাটবে সারাজীবন।

মুদিত পদ্মকলির মত দুটি ডাগর চোখ আমার দৃষ্টির সামনে। থরথর কাঁপছে চোখের পাতা—ভোর রাত্রে পদ্মকলি এমনি করেই বুঝি পাঁপড়ি মেলে। সরার উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম, দুই চোখে দীঘির মত কালো গভীরতা। জল উছলে পড়ল সেই দীঘি ছাপিয়ে চোখের প্রান্ত বেয়ে। কী তোমার মনোব্যথা ওগো কন্যা? ইচ্ছে করে আদর করে চোখ মুছিয়ে দিই। কিন্তু চারিদিকে এত মানুষ—লজ্জায় ঘাড় তুলতে পারি নে। তা হাত দিয়ে চোখ মোছাব!

বাসরঘরে এক শয্যায় আমরা দুজনে। কত রাত্রি হয়েছে, বলতে পারব না। মাটির দেয়ালের কুলুঙ্গিতে পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বলছে। মেয়ে বউগুলো ঠাট্টাতামাসায় অনেক জ্বালাতন করেছে, জানলার বাইরে এখনো পাতান দিয়ে আছে কিনা জানি নে। থাকে থাকুক! ঠোঁটই নড়ছে আমাদের, ঠোঁটে ঠোঁটে সামান্য ব্যবধান—কথাবার্তা কারো আর শুনতে হবে না।

মন্ত্র পড়ার সময় নামটা পেয়েছি—পদ্ম। সেই নিঃশব্দ কণ্ঠে বললাম, পদ্ম তুমি কেঁদেছিলে তখন—

না তো।

তা হলে বলছ কানা তোমার বর?

পদ্ম চুপ করে থাকে।

আমায় পছন্দ হয় নি বোধহয়?

পদ্ম বলল, অমন বললে আমার কত কষ্ট হয় জান! সকলে বলছিল, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি রাগ করতে লাগলে, বিয়ের কিছুতে বসবে না। আগে একবার নাকি বিয়ে হয়েছিল তোমার—একটা মেয়ে আছে শুনে আমার ভয় করতে লাগল। আচ্ছা, ওসব কি সত্যি?

গোটা কলকাতা শহর যায় যাক স্বপ্ন হয়ে—কিন্তু আমার রুবি! বিষম সন্দেহের দোলায় দুলছি। গুটিসুটি হয়ে রুবি আমার কোলের মধ্যে ঘুমোয় আজ পাঁচ পাঁচটা বছর। দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে ফিরতে একটু দেরী হলে। ও বাবা তোমার বিছানা করে রেখেছি এই দেখ। ঐ টুকু মেয়ের কাজ দেখলে অবাক হয়ে যাবেন।...আর, এইখানেই বিয়ে হয়ে গেল খানিক আগে—পাশে নববধূ—উপোস করে ছিলাম এই বিয়ের জন্যে—পথ ভুল করে দেরী হয়ে গেছে বিয়ে বাড়ি পৌঁছতে, সেই জন্য এরা খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিল—এত জনের কাছে শুনে শুনে মনে হচ্ছে এটাই সত্য। যে জীবন এতখানি বয়স

ধরে কাটিয়ে এসেছি, সমস্ত কেমন ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে, ভয় হচ্ছে রুবিও শেষটা ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে না যায়।

এই দেখ, আবার তুমি মুখ অন্ধকার করলে, হাসো—হাসতে হয় গো আজকের দিনে। তোমার মুখে সব সময় যাতে হাসি থাকে সব সময় জীবন দিয়ে আমি তাই করব।

আমিও সেটা মনে-প্রাণে মেনে নিচ্ছি। দ্বিধা-সন্দেহ ভয় অনেক কিছু ছিল, সমস্ত মুছে গেছে এইটুকু সময় পদ্মর সঙ্গে কাটিয়ে। বললাম, পাড়া-গাঁয়ের ব্যাপার—কাল বোধ হয় বাসি বিয়ে-টিয়ে—কাল আর যাওয়া হচ্ছে না, যাব আমরা পরশু সকালবেলা! গিয়েই তুমি রুবিকে কোলে তুলে নিও সকলের আগে। রুবির মা হোয়ো। আমার মেয়ে যদি হাসে—দেখো, কত হাসি হাসব তখন আমি।

পদ্ম বলল, এরা যদি যেতে না দেয়?

সে কি!

ধর, যদি ঘরজামাইয়ের মতো এখানে থাকতে হয় চিরকাল, কোন কিছুর অভাব অনটন রইল না, তুমি মনিব হলে, কর্তা হলে—আমি তো দাসীবাঁদী আছিই, সকলে তোমার হুকুমদার হয়ে কাজকর্ম করবে।

না, না, রুবি তবে ভেসে যাবে না কি?

শুয়ে ছিল পদ্ম, উঠে বসল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে রুবির কথা খানিকক্ষণ। তারপর গুম হয়ে থেকে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল।

সামনে রোয়াক। রোয়াক পার হয়ে কোন দিকে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। চাঁদ উঠেছে, খোলা দরজায় একফালি জ্যোৎস্না ঘরের মধ্যে এসে পড়ল। জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটছে, দিনমানের মত পরিষ্কার।

পদ্ম ফিরে এল একআঁচল স্বর্ণচাঁপা নিয়ে! সুগন্ধে ঘর ভরে গেছে। বলে, নিচু ডালে অনেক ফুটে ছিল। তোমার জন্যে তুলে নিয়ে এলাম। নাও।

দুহাত পেতে নিলাম। অঞ্জলি ভরে গেল। ফোঁস করে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল পদ্ম—আমার বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠে। বললাম, তুমি বড় ভাল পদ্ম—তোমার জন্যে সব ছাড়তে পারি। কেবল সেই আমার মা-হারা মেয়ে—কেউ নেই তাকে দেখাশুনো করবার। পাঁচ-দুয়োরে ঠেলা খেয়ে মরবে। আসবার সময় দু-হাতে আমায় জড়িয়ে ধরেছিল, হাত ছাড়িয়ে চলে এলাম।

আবার বলি, রাগ করলে পদ্ম?

জবাব দিতে গিয়ে পদ্মর কথা ফোটে না। জোৎস্নার আলোয় মুখখানা উচুঁ করে তুলে ধরে। বললাম, কী ভাবছ তুমি বল—

চল কথা বলতে বলতে যাই।

কোথায় ?

এস না। এদের কথায় এদ্দুর পারলে, আমার কথায় যাবে না কেন ?

বিয়েবাড়ি এখন শান্তিতে বেঁহুশ হয়ে ঘুমোচ্ছে। একটি মানুষ জেগে নেই। তেমাথার তেঁতুলগাছ ছাড়িয়ে দুই চোর আমরা টিপিটিপি চলেছি। আরও খানিক এগিয়ে পদ্মর এবার গলা ফুটল। আহা, গানের সুরও এমন মিঠা হয় না। বলে, রুবির কথা ভাবছি। মা না থাকার কষ্ট আমি জানি। আমারও মা নেই—ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরে মারা গেলেন। তখন আমি একেবারে ছোট, ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ে। বাবা আর গাঁয়ের মানুষরা ঘুরতে ঘুরতে শেষটা এই দক্ষিণ দেশের ধান চালের আবাদে এসে নতুন করে ঘরবাড়ি তুললেন।

আমি বললুম, ছিয়াত্তুরে নয়—পঞ্চাশের মন্বন্তর। তোমার ভুল হচ্ছে।

এই তো সেদিনের কথা—ভুল হবার কি আছে! পলাশিতে সিরাজদ্দৌলার নবাবি গেল, তার পরেই তো।

পদ্ম পাগল নাকি তবে ? এতক্ষণের এত কথাবার্তায় তো টের পাই নি। চলার ধরনেও মনে হচ্ছে পাগল বটে। হাত ধরে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে আমায়।

আমি বলি, আস্তে আস্তে—

পদ্ম আকাশের দিকে তাকায়। শুকতারা উঠে গেছে। আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠে, গতিবেগ আরও বাড়ায়। বলে, সকাল হয়ে গেলে আর তুমি যেতে পারবে না। কোনদিন যাওয়া হবে না। এস, এস—বাঁধে উঠতে হবে ভোর হবার আগে।

পায়ে কত কাঁটা ফুটল, নখ ছিঁড়ে গেল উচুঁ নিচু মাটির আঘাত লেগে, শামুকে পা কাটল জলের মধ্যে দিয়ে যেতে। সে যে কত পথ চললাম, তার হিসেব নেই। অবশেষে বাঁধ দেখতে পাচ্ছি—বাঁধের উপরের সেই গাছগুলো।

বাঁধের নিচে এসে পদ্ম হাত ছেড়ে দিল। বলে, দাঁড়াও একটু।

দুই পায়ে গুঁজে সে প্রণাম করল। অনেকক্ষণ করছে, ওঠে না।

সস্নেহে তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে বলি, আবার দেখা হবে পদ্ম। আমি

আসব।

গাছে চড়ার মত দুহাত ধরে উঁচু বাঁধে উঠছি। নোনা নদী ঝিকমিক করছে গোলঝাড়ের ওদিকে। গা শিরশির করে ওঠে—বড্ড শীত।

পদ্ম, জ্বর আসার মতন হচ্ছে। কাঁপুনি লেগেছে।

কোথায় পদ্ম? তাকিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। বাঁধের আড়ালে পালিয়ে কৌতুক করছে বুঝি!

পদ্ম, পদ্মরাণী—

মুক্ত আকাশ-তলে গাঙের কিনারে শীতে কাঁপতে কাঁপতে কত ডাকলাম! পদ্ম যেন বাতাসের সঙ্গে মিশে গেছে।

সকাল হল। দিনের আলোয় মাঠের দিকে তাকিয়ে অবাক। মাঠ কোথা। বিশাল জলাভূমি। কিন্তু আমি যে এই কেওড়া-গাছ তলা থেকে ডাইনে নেমেই বিয়েবাড়ি গেছিলাম। ভুল হবে কেমন করে? ঠোকর খেয়ে ডান-পায়ের একটা নখ উল্টে গেছে। আর জামার পকেট ভর্তি পদ্মর দেওয়া স্বর্ণচাঁপা। জলের মধ্যে, আর যাই হোক, স্বর্ণচাঁপা ফুটবার কথা নয়।

কপাল ভাল—বিকেলবেলাই নৌকো পেয়ে গেলাম, গোলপাতা কাটতে এসেছিল, ফিরে যাচ্ছে। নৌকো না পেলে রাত্রিবেলা জলজঙ্গলের মধ্যে বাঘের পেটে না-ও যদি যাই—অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় কার্তিকমাসের নতুন হিমে কেওড়াতলায় নিশ্চয় মরে পড়ে থাকতাম। আরও এক তাজ্জব ব্যাপার—কাল সবে এসেছি, একদিনের মধ্যে বোশেখ থেকে কার্তিকমাসে পৌঁছই কি করে?

দুকড়ি মাঝি মাতলায় থাকে। এ-কদিন অনেকের সঙ্গে এই গল্প করেছি। নৌকো থেকে ডাঙায় পা দিয়েই দুকড়ির কাছে গেলাম। বাদাবনের সকল সুলুকসন্ধান তার নখদর্পণে। এখন শক্তি সামর্থ্য নেই, আর বাদায় যেতে পারে না, দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে তামাক টানে। লোকজন কাউকে পেলে বাদাবনের গল্প শোনায়।

দুকড়ি বলে, জায়গাটা চিনলাম—শোলাদানার বাঁওড়। শোলাদানা বলে জমজমাট এক গাঁ ছিল—ভূমিকম্পে বসে গিয়ে বাঁওড় হল সেখানে। পুরো গ্রামই আছে জলের তলে, দায়ে দরকারে কখনো ভেসে ওঠে। শোলাদানায় গিয়ে তুমি যে আমার ফিরে এলে—এমন কখনো হয় না। জোর কপাল বটে তোমার। □
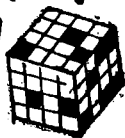
এক মিনিট। প্লিজ! একটু ধৈর্য ধরুন।

বুঝতে পারছি টেবিলের উপর ঐ রঙীন প্লাস্টিকের চৌকো জিনিসটা আপনার চোখে পড়েছে। আজকাল অনেক বাড়িতেই ছেলেমেয়েদের হাতে এই জিনিসটা দেখবেন। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। জিনিসটা দেখতে কিন্তু খু-উব সুন্দর। এর ছ'টা দিকে ছ'টা মন ভোলানো রঙ ছোট বড় সকলকেই সমান আকর্ষণ করে। একটু ভাল করে কাছে গিয়ে দেখুন প্রতি দিকেই নানা রঙের দাবার ছকের মতো। তাই না?

—উহুঁ, উহুঁ—হাত দেবেন না। কাছে গিয়ে দেখুন ক্ষতি নেই। কিন্তু হাতে নিয়েছেন কি হয়ে গেল। অঘটন ঘটাতে ওস্তাদ। দেখতে নিরীহ, কিন্তু আসলে একটা আজব ধাঁধা। আমার এক ডাক্তার বন্ধু যা কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন, তারপর থেকে সত্যি বলতে কি—আপনাদের অর্থাৎ যাঁরা তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর পেরিয়েছেন, তাঁদের নিয়ে আমি খুব ভয়ে ভয়ে আছি। না জানি আবার কি কাণ্ড ঘটে যায়।—ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। অপরাধী তো আমাকেই করবেন। কারণ?—মূর্খের মতো মাস চারেক আগে এর উপর একটা বাংলায় গাইড বই লিখেছি। আর সেই হয়েছে আমার কাল। শুধু গত মাসেই সাতটা চিঠি পেয়েছি। পাঁচজন ভদ্রমহিলা আর দু'জন ভদ্রলোক—আমাকে বেশ একহাত নিয়েছেন। মহিলাদের অভিযোগ, তাঁদের কর্তারা কোনক্রমে অফিস করেন, আর বাড়িতে বসে কিউব ঘোরান। বাজার করা, রেশন আনা, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে

দেওয়া—সবই নাকি এখন তাঁদের করতে হচ্ছে। একজন এর মধ্যে লিখেছেন, তাঁর কর্তার বোধহয় চাকরি থাকবে না! প্রায়ই নাকি অফিস কামাই করে কিউবের ধাঁধা নিয়ে পড়ে থাকেন। এদিকে এক ভদ্রলোক লিখেছেন, তাঁর ছেলের একটা কিউব আছে। বাংলায় গাইড বই পেয়ে তাঁর স্ত্রী সকাল, দুপুর, রাত্রি প্রায় সব সময়ই কিউব নিয়ে বসে আছেন। ফলে, রান্না-বান্না, ঘর-সংসার সব শিকেয় উঠেছে। ভদ্রমহিলা সাফ বলে দিয়েছেন, এটা উওম্যান্স্ লিবারেশনের যুগ। সংসারের কাজ আর করতে পারবেন না। নয় নিজে কর অথবা সর্বক্ষণের লোক রাখ। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে তিনি পিছিয়ে থাকবেন কেন?—একটা ব্যাপারে পত্র লেখক-লেখিকারা সকলেই একমত—আমিই নাকি এ-জন্য দায়ী। বিদেশী ভাষায় বই ছিল, ভাল ছিল। বাংলায় কেন লিখতে গেলাম? ডিভোর্স যদি হয়, আমার বিরুদ্ধে তিনজন মামলা করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। বুঝুন অবস্থা। বিদেশে অবশ্য শুনেছি, এই কিউব নিয়ে বেশ কিছু ডিভোর্স হয়েছে। কিন্তু, তাই বলে আমাদের দেশে!

আপনারা যাঁরা বুদ্ধিমান, সজ্জন, তাঁরা বুঝবেন অপরাধটা আমার নয়। তবুও ডাক্তার বন্ধুর কাণ্ডের পর—আমার স্ত্রী যা মধুর বচন শুনিয়েছেন, তাতে ঘরে-বাইরে আমার তিষ্ঠোনো দায় হয়ে পড়েছে।

অথচ যারা আসল অপরাধী, তারা কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত হয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার ঘরে তুলছে। আমার এত হেনস্থার মূল আসামী কে কে জানেন?—এক নম্বর এরণো রুবিক। দ্বিতীয় আসামী ডন্ টেলর। আর তৃতীয়-ও একজন আছে। তবে আইনে তাকে ঠিক আসামী করা যাবে না। পাট্রিক বোজার্ট—মাত্র তেরো বছর বয়স। ভাবছি বিশ্বআদালতে দেব, এদের নামে কেস ঠুকে দশ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়ে।

ঠিক কথা! এদের অপরাধটা তো আপনাদের জানা দরকার। গত তিন চার বছর ধরে পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট ছেলে মেয়ে থেকে আরম্ভ করে বুড়োবুড়ি—সবাইকে পাগল করে তুলেছে ঐ ছোট্ট চৌকো প্লাস্টিকের জিনিসটা। আর এটা বের করেছেন, হাঙ্গেরীর এক আর্কিটেক্ট অধ্যাপক এরণো রুবিক। তাঁর ছাত্রদের 'থ্রি-ডাইমেনশনাল' অধ্যায় যতই বোঝান, মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি। ঠিক যেমন করে বোঝাতে চান, তেমন হচ্ছে না। দিনের পর দিন কাঠের নানা রকম মডেল তৈরী করে যখনই সময় পান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন, আর চিন্তা

করেন। সেই ভাবনা চিন্তা থেকেই অবশেষে ১৯৭৪ এ আবিষ্কার করলেন —আজকের পৃথিবীর বিস্ময় "কিউব"—যা রুবিক কিউব নামে বিখ্যাত। ১৯৭৭ এ প্লাস্টিক কিউব তৈরী হয়ে, ১৯৭৮ থেকে শুরু হোল বিশ্ববিজয়। ইয়োরোপ, ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান—আর-ও কত দেশ। আমাদের ভারতবর্ষ-ও বাদ গেল না। এর ওপর এ বছর থেকেই আমাদের দেশে এই আজব ধাঁধার জিনিসটা বানানো শুরু হয়ে গেছে। এবার বুঝুন কি অন্যায় এরণো রুবিকের। বেশ তো, তোমার 'টু,' 'থ্রি,' 'ফোর'...যত ডাইমেনশন খুশী জিনিস আবিষ্কার করো না, কিন্তু সারা বিশ্বে ঢাক পেটাবার কি দরকার ছিল!

এবার শুনুন দ্বিতীয় আসামীর কথা। সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের অধ্যাপক ডন্ টেলর। ১৯৭৮-এ তিনি রুবিক কিউবের সংস্পর্শে এসে পড়েন। কি আশ্চর্য—কোথায় হাঙ্গারী, আর কোথায় অস্ট্রেলিয়া। কিছুদিনের মধ্যে তিনি এই কিউবের মধ্যে খুঁজে পেলেন আজকের বিজ্ঞানের সোপান—অঙ্কের এক বিশেষ দিক। ব্ল্যাক-বোর্ড বা খাতা কলম নয়। এই কিউবকে কাজে লাগালেন ছাত্রদের Symmetry of Mathematics (The Theory of Groups) বোঝানোর জন্য। শুধু তাই নয়, দু-চারটে বই-ও লিখে ফেললেন। ভবিষ্যৎবাণী করলেন, কিউব গণিত শাস্ত্রে তথা বিজ্ঞানের এক নতুন দিক উন্মোচন করতে যাচ্ছে।

বুঝুন অবস্থা! একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর! ব্যস, আরম্ভ হয়ে গেল। স্কুলে, কলেজে, বাসে, ট্রেনে সবার হাতে কিউব। যার অবশ্যম্ভাবী ফল, আমার তৃতীয় নাবালক আসামী পাট্রিক বোজার্ট। সুইজারল্যাণ্ডে দিদিমার কাছে বেড়াতে গেছে। কোথায় ভাল ভাল কেক, পেস্ট্রি খাবে, আর বেড়িয়ে বেড়াবে—না একটা কিউব জোগাড় করে বসে গেল। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে অসাধ্যসাধন করলো। কিউবের সবচেয়ে জটিল ধাঁধা অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় ফেরা—তা মাত্র দেড় মিনিটে করতে লাগলো। আর এদিকে বড় বড় পণ্ডিতরা দিনের পর দিন মাথা ঘামাচ্ছেন। ১৯৮১ তে ছেলেটির নামে বই-ও বেরিয়ে গেল। চারিদিকে হৈ-চৈ। লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হতে লাগলো।

কপাল খারাপ। অধম প্রায় এই সময় কয়েক সপ্তাহের জন্য বিদেশে গিয়েছিল। ব্যস, গোলক-ধাঁধায় পড়লাম। প্রথমে চুপি চুপি চেষ্টা করতাম। বাড়িতে কখনো অনেক রাত্রে, অথবা অফিসে চুপচাপ নিজের ঘরে। অবশেষে

সমাধানে পৌঁছোলাম। মনে অনেক আশা নিয়ে বাংলা দেশের ছেলেমেয়ে-দের কথা চিন্তা করে বাংলায় গাইড বইটা লিখলাম। মূলতঃ দুটো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। এক—ছোট ছেলেমেয়েদের আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য্য, একাগ্রতার প্রকাশ। আর সেই সঙ্গে আই-কিউ এর উন্নতি ঘটানো। যাতে যে কোন সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বাঙালী ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে না থাকে। কিউবের এই গুণগুলির বিষয়ে দেশ বিদেশের জ্ঞানী গুণী সকলেই একমত। দুই—ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যখন জোর কদমে কিউবের চর্চা চলছে, তখন বাঙালীরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন?

হলফ করে বলছি, ও ছাড়া আর কোন বৃহৎ ব্যাপার তখনও ভাবিনি। তবে আজ মনে হচ্ছে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ছোটখাট উপ-কারে জিনিসটা কাজে লাগতে পারে। শুনবেন নাকি তার দু-একটা?, ধরুন, বাড়িতে যদি কিউব থাকে :

(১) বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের চমৎকার সময় কাটবে। অহেতুক আপনার গৃহিনী-পনায় নাক গলাবেন না। গিন্নীরা নিশ্চয়ই খুশী?

(২) মুখরা স্ত্রী থাকলে, তাঁকে কিউবের নেশা ধরিয়ে দিন। দেখবেন বাড়ি নিস্তব্ধ। বলতে হবে না, কর্তাদের মুখ দেখেই বুঝছি।

(৩) অফিস ফেরৎ নিশ্চিন্তে বাড়িতেই যদি সময় কাটাতে চান (বিশেষতঃ মাসের শেষে যখন পকেটের অবস্থা কিছুটা কাহিল) সোজা কিউব নিয়ে বসে যান। দেখবেন ক্ষিদে তৃষ্ণা ভুলে গেছেন। তাছাড়া গোপনে বলে রাখি, বাড়ির নানারকম কাজ যা আপনাকে মুখ বেজার করে করতে হয়, আস্তে আস্তে দেখবেন গিন্নীর কাছে চলে গেছে।

এ ছাড়া আরও হরেক রকম সুবিধে আছে। কিন্তু কিউবের যে হঠকারিতা তা জানতাম না। ঠেকে শিখেছি। শুনবেন নাকি কাহিনীটা?

আমার বাড়ির কাছেই এক ডাক্তার বন্ধু থাকেন। তাঁর মেয়ে মনা সামনের বার মাধ্যমিক দেবে। কয়েক মাস হোল একটা কিউব কিনেছে, সেই সঙ্গে বইটাও। সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েটার মেধা আছে। মাত্র মাসখানেকের মধ্যেই রপ্ত করে ফেলেছে। প্যাট্রিক বোজার্টের মতো দেড় মিনিটে না হোক, প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আসল ধাঁধাটা সমাধান করতে পারে।

মাসখানেক আগে একদিন সন্ধ্যার পর বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা মারতে গেছি সস্ত্রীক। দেখি বন্ধুবর চেম্বার থেকে ফিরে গভীর মনোযোগে তাঁর মেয়ের

কিউবটা নিয়ে ঘোরাচ্ছেন। আমায় দেখে হেসে বললেন, 'আরে এসে গেছ। তোমার কথাই ভাবছিলাম। অনেকদিন বাঁচবে।' বললাম, 'তা তো হোল, কিন্তু কিউব নিয়ে কি হচ্ছে?' আমাদের গলা পেয়ে ওর স্ত্রী রমা এসে বসেছে। হেসে উত্তর দিলেন—'চেম্বার থেকে ফিরে দেখি, মনা ও ঘরে পড়ছে, রমাও কি-সব সেলাই-টেলাই নিয়ে ব্যস্ত। তাই ভাবলাম, দেখি না কি এমন হাতি ঘোড়া জিনিস এই কিউব।' তারপরেই কিউবটা হাতে তুলে বললেন, 'দেখ দেখ কি সুন্দর সুন্দর নানা রকম নক্শা তৈরী হয়েছে।' বিভিন্ন দিকে দু'চারবার পাক ঘুরিয়ে নক্শাগুলো পালটে আবার অন্য রকম সব নক্শা ফুটিয়ে তুললেন। উল্লসিত হয়ে বললেন, 'বেশ মজার খেলা, না?'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'যাক, তোমার-ও ধরেছে। তা বইটার কিছু পড়েছ?'

বন্ধু আমতা আমতা করেন, 'বোঝ তো ডাক্তার মানুষ, সময় কম। প্রথম দু'একটা চ্যাপ্টার পড়েছি। তারপর আর পড়া হয়নি। মনে হচ্ছে দরকার-ও হবে না। আরে বাবা, এককালে তো অঙ্কে ভাল ছাত্রই ছিলাম। কি বলো?'

আমি মাথা নেড়ে সায় দিই। একটু মজা করার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, 'আরে, সে আর বলতে। একসঙ্গে স্কুলে, কলেজে পড়েছি—দেখেছি তো। তোমার তো Higher Mathematics নিয়ে পড়া উচিত ছিল। কেন যে ডাক্তারী পড়লে! যাই হোক, আসল ধাঁধাটা সমাধান করেছ তো?' বললেন, 'না, না, সেটা পরে হবে। ছ'টা দিকে ছ'টা রঙ আনতে হবে, এই তো? ও-হয়ে যাবে। সেটার জন্য ভাবছি না। ভাবছি এই যে নানা দিকে নানারকম নক্শা হচ্ছে—কিন্তু কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই! অথচ শুনেছি, ছ'টা দিকে একই রকম নক্শা, অথবা দু-দিকে, চারটি দিকে একই রকম নক্শা করা যায়।'

বললাম, 'এটাই তো Symmetry of Mathematics! আর এগুলোই তো আসল নক্শা। আর বেশী নক্শা করা-ও যায় না। মাত্র কয়েক হাজার কোটি।'

বন্ধুর কণ্ঠে উষ্মা ও অবিশ্বাস, 'মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনি? এইটুকু কিউবে এত নক্শা করা যাবে। তারপর নরম হয়ে বললেন, 'থাক ওসব। এবার বল তো, এ-ধরনের নক্শা কি করে করা যাবে?'

মনে হোল একটু শিক্ষা দেওয়ার দরকার। বললাম, 'খুব সোজা।

আগে তুমি কিউবটাকে প্রথম অবস্থায় ফিরিয়ে আন। অর্থাৎ ছ'টা দিকে ছ'টা রঙ। তারপর আমি কয়েকটা সূত্র দিয়ে দেব, সেই মতো ঘোরালেই ঐ ধরনের নক্শা তৈরী হবে।' পাশেই টেবিলের উপর গাইড বইটা ছিল। হাতে নিয়ে বললাম, 'এককালের মেধাবী ছাত্রের বইটা নিশ্চয়ই দরকার হবে না। আর যদি একান্তই প্রথম অবস্থায় ফিরতে না পার, তোমার মেয়ে মনা তো শিখে গেছে। ওকে বোলো, করে দেবে।' আমার কথায়, আমার স্ত্রী ও রমা হেসে উঠলো। বন্ধু ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, 'বুঝেছি, তোমরা সবাই আমাকে ঠাট্টা করছো। ঠিক আছে, প্রথম অবস্থায় ফিরেই তোমাকে ফোন করবো। কাল সন্ধ্যেবেলায় আমি তোমার বাড়ি গিয়ে সূত্রগুলো নিয়ে আসবো। তোমার সাহায্য চাই না। মনারও নয়। কথা দিচ্ছি।'

সভয়ে বলি, 'সারা রাত জাগবে নাকি?'

'আরে দূর! খুব বেশি ঘণ্টা দুয়েক। কাল সকালে চেম্বার আছে। রুগীরা বসে থাকবে না? তুমি কি ভাব বলতো আমাকে? বারো তেরো বছরের ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত করে ফেলছে। আর আমি পারবো না?' আমি বলি, 'না-মানে আমার মাথাটা তো তোমার মতো 'সার্প' ছিল না? তাই আমাকে অনেক বই-টই পড়তে হয়েছে।—ঠিক আছে কাল দেখা হবে।' বাইরে এসে বন্ধুর স্ত্রী রমাকে বললাম, 'ওর খাবার ঢেকে রেখে তোমরা শুয়ে পড়। কিছুক্ষণ পরে ও নিজেই ক্লান্ত হয়ে খেয়ে শুয়ে পড়বে।'

পরদিন ভোরে অফিসের কাজে জামসেদপুর চলে গেলাম। আগেই ঠিক ছিল। কিন্তু ইচ্ছে করেই বন্ধুকে বলি নি। দু'দিনের মাথায় ফিরলাম। রাত প্রায় দশটা। বাড়ি ঢুকে দেখি আমার স্ত্রী ও রমা দু'জনেই রমার ঘরে আমার অপেক্ষায়। চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন।

শঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করি—'কিছু হয়েছে নাকি? সকলে ভাল আছে তো? ছেলে মেয়েরা?'

গৃহিণী প্রথমে আক্রমণ করলেন—'আচ্ছা, তোমার কি আক্কেল বলতো? ডাক্তারকে তোমার ঐ 'কিউব' ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলে? একবার ভাবলে না—কি হতে পারে?'

'কেন, কি হয়েছে?'

রমা বিষণ্ণ মুখে বললো, 'আজ দু'দিন কিউব নিয়ে পড়ে আছে। ঘুম, খাওয়া প্রায় নেই বললেই হয়। প্রায় আধ পাগল অবস্থা। রুগীরা ফোন করলেই বলে, বলে দাও ভীষণ অসুস্থ। মুখে একটাই কথা—আপনি ফেরার

আগে ওকে ধাঁধাটার সমাধান করতেই হবে। মানা করলে, চটে যাচ্ছে। কারও কথা শুনছে না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাতে কিউব নিয়ে বসে থাকে?'

রমা বললো, 'রাত-দিনের কোনও ঠিক নেই। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন খানিকটা খায়, ঘুমোয়। উঠেই আবার শুরু হয়ে যায়।'

বুঝলাম, আর দেরী করা উচিত নয়। জামাকাপড় পালটে রমাকে নিয়ে মিনিট দশেকের মধ্যেই ওদের বাড়ি পৌঁছলাম। ভাগ্য ভাল। বন্ধু শুনলাম বাথরুমে স্নান করছেন। বুঝলাম, নির্ঘাৎ মাথা গরম হয়ে গেছে, চিন্তা করতে করতে। কিউবটা টেবিলের উপর পড়ে আছে। পাশে একটা খোলা খাতা। অনেক লেখা-জোখা। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বন্ধুবর বেরুলেন। আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন। সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ। পরে সামলে নিয়ে বললেন, 'প্রায় করে ফেলেছি। ছ'টা দিকের দুটো দিক হয়েছে। আর বাকি চারটে কালকের মধ্যেই করে ফেলবো। জানোই তো ডাক্তার মানুষ—রুগী দেখতে দেখতে একদম সময় পাই নি।'

তাঁর কথায় প্রতিবাদ না করে কিউবটা পাঞ্জাবীর পকেটে পুরে বললাম— 'চলি হে, বড় ক্লান্ত লাগছে। কাল দেখা হবে।' কথা শেষ করেই আমি একেবারে বাড়ির বাইরে।

বন্ধুর উচ্চ কণ্ঠ কানে গেল—'কিউবটা নিয়ে যাচ্ছ কেন? This is unfair! Unsporting!' (বাঙালী মাত্রেই রেগে গেলে ইংরাজি বলে)।

পরে রমা টেলিফোনে জানিয়েছিল, সেই রাতে আমাকে কিছুটা গালমন্দ করে দুটো Campose খেয়ে লম্বা ঘুম দিয়েছিলেন বন্ধুবর। পরের দিন থেকেই ডাক্তার সাহেব সুস্থ। আমিও সেই সঙ্গে কান মুলেছি।

কয়েকদিন পরে বন্ধুবর সস্ত্রীক মেয়েকে নিয়ে আমার বাড়িতে হাজির। দেখা মাত্র বললাম—'কিউব নেই, ফেলে দিয়েছি।' হেসে বললেন, 'না হে, কিউবটা এবার তুমি মনাকে ফিরিয়ে দাও। তোমার বইটা আগাগোড়া পড়েছি। গোঁয়ার্তুমি করতে গিয়ে আমি এক গোলকধাঁধায় পড়েছিলাম। এখন মোটামুটি বুঝতে পারছি। এটাকে এখন আমি অবসর বিনোদন হিসেবে নেব। কাজের কোন ক্ষতি না করে।'

আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। ক্ষমা চেয়ে বললাম, 'জিনিসটার গভীরতা বোঝাতে তোমাকে কিছুটা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এতটা হবে

ভাবিনি। ছোটরা যত তাড়াতাড়ি এটার মধ্যে ঢুকতে পারে, সে তুলনায় বড়-দের সময় লাগে বেশি। আসলে এটা খেলা নয়—অঙ্কের এক আজব ধাঁধা। সারা বিশ্বে গবেষণা চলছে। আমার মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে শুধু Digital Case বেরুবে তাই নয়, Computer Science-এ এর ব্যাপক ব্যবহার হবে। অর্থাৎ, আমাদের সকলেরই হাতে একটা করে Computer Case থাকবে, যা মোটামুটি আমাদের দৈনন্দিন অনেক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।'

ডাক্তার বন্ধু উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন প্রায়।

—'বল কি হে। তাহলে তো আমাদের অর্ধেক ঝামেলাই কমে যাবে। এখন দেখছি জিনিসটা শুধু ইন্টারেস্টিং নয়—ফ্যানট্যাস্টিক!' ☐

২০৮১ সাল

আকাশবাণী কলকাতা। একটি দুঃসংবাদ :

আজ পশ্চিমী জোটের দেশগুলো পূর্বজোটের দেশগুলোর ওপর তাদের প্রথম পাঁচটি অ্যান্টিম্যাটার বোমা ফাটায়। এতে কয়েকটি দেশ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় যুদ্ধ থেমে গেছে বটে কিন্তু সেইসঙ্গে একটি নতুন বিপদের সূচনা দেখা দিয়েছে।

বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন যে বোমার বিস্ফোরণে সমুদ্রগুলতে যে পৃথিবী জোড়া ঢেউ উঠেছে তাতে যে-কোন মুহূর্তে সমস্ত স্থলভাগ সমুদ্রের তলায় চলে যেতে পারে। আপনারা......

একটা প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেল রেডিও। —*তমিস্র কুমার*

তখন সবে শুরু হয়েছে রাজসভা। এমন সময় সেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে এক বিরাট সেলাম ঠুকলেন।

'কি ব্যাপার, এবার কোন্ পরিকল্পনা? দেখ বাপু বেশী বক্ বক্ করো না। কম কথায় সারবে।'

'না,না, বেশী কিছু না,' বলেই এক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলেন বৈজ্ঞানিক। চারপাশ থেকে কয়েকজন কাগজের উপর উঁকিঝুঁকি মেরেই বেজার মুখে বসে পড়ল।

'মহারাজ, এই পরিকল্পনাটা অত্যন্ত আধুনিক এবং আমাদের প্রতিরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। আমি একরকম লোহার পাত আবিষ্কার করেছি, বন্দুকের গুলিও যাকে ভেদ করতে পারবে না। লোহার পাতটা যদি আমাদের যুদ্ধ জাহাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে আমাদের যুদ্ধ জাহাজ চির-দুর্ভেদ্য হবে এবং যেখানে খুশী সেখানে যেতে পারবে। এর দাম একলক্ষ মুদ্রা।'

'খাজাঞ্চি মশাই, একলক্ষ মুদ্রা।'

মহারাজের কথা শেষ হতে না হতেই সেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তাঁর অন্য পকেট থেকে আরেকটি কাগজ বের করলেন।

'মহারাজ, আমার এই আবিষ্কার অনুযায়ী বন্দুক তৈরী করলে, তার গুলির কাছে যে কোন লোহার পাতই হবে শিশু। এই ফরমুলাটি মহারাজ,

আপনার ভাই কিন্তু কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনার ও আমার দেশের কথা মনে রেখে, এটি ওনাকে আমি বিক্রি করি নি। মহারাজ, এটিরও দাম কিন্তু একলক্ষ মুদ্রা।'

'খাজাঞ্চি মশাই, আরও একলক্ষ মুদ্রা দিন।'

'আর মহারাজ, এই আবিষ্কারের ফলে এক অপূর্ব দুষ্প্রবেশ বিমানের······'

'ব্যস, থামো। কে আছিস, এর জামাকাপড় তল্লাসি করে দেখ, আর ক'টা পকেট আছে।'

'মহারাজ, পঁয়তাল্লিশটা।'

অত্যন্ত করুণ এবং ভয়ার্ত স্বরে সেই বিজ্ঞানী চীৎকার করে উঠলেন—'না, না, মহারাজ, মাত্র চুয়াল্লিশটা পকেটে বিভিন্ন ফর্মুলা সংক্রান্ত কাগজ পত্র আছে, বাকি একটাতে একটু নস্যি, আর কি?'

'খাজাঞ্চি মশাই, একে মোট চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা দিয়ে দেবেন। আর মন্ত্রীমশাই, ঢ্যাড়া পিটিয়ে দিন যে কাল সকালেই এই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে শূলে চড়ানো হবে।'* □

*Embross Bierce য়ের The Ingenious Patriot অবলম্বনে।
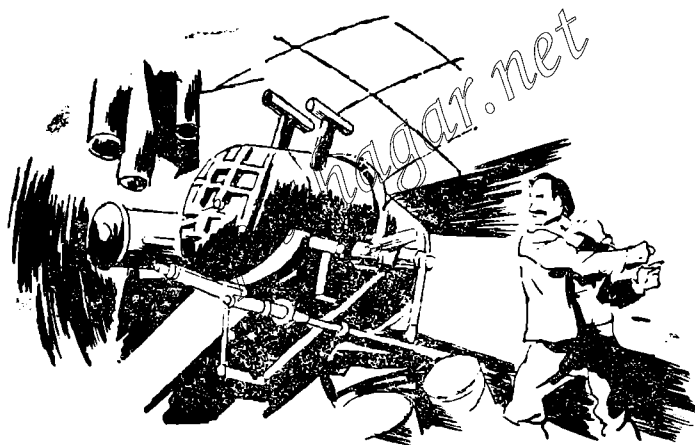
মহীপালের মহাযাত্রা

সুমিতকুমার বর্ধন

অপূর্বদার বাড়িতে গেলেই আমার মনে হত একটা মিউজিয়ামে এসেছি। দেওয়ালে টাঙানো নানা রকমের প্রাচীন যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রশস্ত্র, কাঁচের শোকেস ভর্তি নানা পুরোনো জিনিসপত্র, আর চতুর্দিকে পুরনো জিনিসপত্রের কি রকম একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ। সব মিলিয়ে অপূর্বদার ঘরগুলো আমার মনে কি রকম একটা নেশা ধরিয়ে দিত।

অপূর্বদার চেহারাটাও এই পরিবেশের সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। বুক অবধি কাঁচাপাকা দাড়ি, চোখে মোটা লেন্সের চশমা, আর গায়ে একটা মান্ধাতার আমলের ড্রেসিং গাউন। এই সব নিয়ে অপূর্বদাকে আমার একটা সংগ্রহ বলেই মনে হত।

অপূর্বদা সম্পর্কে আমার দাদা হলেও বয়সে আমার মার থেকেও বড়। আমার বড় মাসীমার একমাত্র সন্তান। মেসোমশাই ছিলেন এক জাঁদরেল ব্যারিস্টার। পয়সা উপার্জন করতেন দু-হাতে। কিন্তু উপার্জনের চোদ্দ আনাই সঞ্চয় করতেন। ফলে অপূর্বদার পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মেসোমশাই যখন চোখ বুজলেন, তখন অপূর্বদার জন্যে যা টাকা রেখে গেলেন তাতে অপূর্বদা সারা জীবন পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে দিতে পারে।

অন্য কেউ হলে হয়ত বাবার মৃত্যু শোক কাটিয়ে উঠেই দেদার ফুর্তি করতে আরম্ভ করত। কিন্তু অপূর্বদা বরাবরই অন্যরকমের। প্রত্নতত্ত্বে ডক্টরেট

পাঁচবছর। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যেতেই পা বাড়ালেন আমেরিকার দিকে। কলকাতায় অপূর্বদাদের বিশাল বাড়িটা আগলে একা পড়ে রইল বড়মাসীমা।

দশ বছর বাদে বড়মাসীমা মারা গেলেন। খবর পেয়ে অপূর্বদা দেশে ফিরলেন। সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে এবার দেশেই থাকবেন। আমেরিকার যে মিউজিয়ামের গবেষক ছিলেন, চিঠি লিখে সেখানকার পদ ত্যাগ করলেন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বকে পেশা হিসেবে ত্যাগ করলেও নেশা হিসেবে ধরে রাখলেন। বিরাট বাড়িটা ভরিয়ে তুলতে লাগলেন প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহে।

অন্য সব আত্মীয়স্বজনদের থেকে আমাকে অপূর্বদা কেন জানি না, একটু বেশীই ভালবাসতেন। আর আমারও একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল অপূর্বদার সংগ্রহের প্রতি।

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একবার করে ছুটতাম অপূর্বদার বাড়ি। এক-একটা জিনিস দেখিয়ে অপূর্বদা গল্পের মতন করে বলে যেতেন। জিনিসটা কি, কোথেকে পাওয়া, তা থেকে কি কি ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যায়। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনতাম।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা অপূর্বদার ঘরে ঢুকতেই অপূর্বদা বললেন—'দরজার খিলটা এঁটে দে। একটা নতুন জিনিস কিনেছি, তোকে দেখাব।'

দরজার খিলটা এঁটে দিয়ে চেয়ারে এসে বসতে অপূর্বদা পাশের টেবিল থেকে একটা তামার মূর্তি তুলে আমার হাতে দিলেন।

—'এটা অনেক কষ্টে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে জোগাড় করতে পেরেছি।'

হাতে ধরে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলাম মূর্তিটা, আগাগোড়া তামার তৈরী। অপূর্বদার সঙ্গে পুরনো জিনিসপত্র ঘেঁটে ঘেঁটে প্রাচীন শিল্পরীতির সম্বন্ধে আমার একটু সামান্য জ্ঞান জন্মেছিল। কিন্তু ভ্রূ কুঁচকে অনেকক্ষণ চিন্তা করে মূর্তিটার সম্বন্ধে কোনো সূত্র খুঁজে পেলাম না।

হাত বাড়িয়ে মূর্তিটা অপূর্বদার হাতে দিয়ে দিলাম।

—'কোথাকার মূর্তি এটা অপূর্বদা?'

—'জানি না। সারাদিন ধরে বাড়িতে যত বই আছে সব ঘেঁটেও এর সম্বন্ধে কোন খবরই আমি জোগাড় করতে পারি নি। কোথাকার মূর্তি জানা দূরে থাক, এটা কোন রীতিতে তৈরি—তাই আমি বুঝতে

পারি নি।'

—'তাহলে কিনলেন কেন? যদি জাল হয়?'

—'জাল সম্ভবত নয়। কারণ.........'

—'কারণ?'

একটু সলজ্জ ভাবে হাসলেন অপূর্বদা।

—'কারণ আটমাস আগে এটা ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে চুরি গিয়েছিল। কাগজে মূর্তির ছবি সমেত চুরির খবরটা বেরিয়েছিল।'

—'আর আপনি সব জেনেও মূর্তিটা কিনলেন!'

অপূর্বদা এবার একটু রেগে গেলেন মনে হল।

—'কেন কিনব না? মূর্তিটা যে ভারতবর্ষের সে সম্বন্ধে তো কোন সন্দেহ নেই! আর ভারতবর্ষ থেকে মূর্তিটা কি ভাবে ব্রিটেনে গিয়ে থাকতে পারে, সেইটা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না।'

—'কি করে বুঝলেন মূর্তিটা ভারতীয়? অন্য কোন দেশেরও তো হতে পারে!'

—'আরে বুদ্ধু, মূর্তিটা যে ভারতীয় সে খবর কাগজেই বেরিয়েছিল। আর না বেরোলেও, মূর্তিটার এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যার থেকে এক নজরেই বোঝা যায় এ-জিনিস ভারতীয়।'

এটা অবশ্য অপূর্বদা ভুল বলেন নি। মূর্তিটা দেখে আর যাই হোক না কেন, সেটা যে ভারতীয় সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না।

মূর্তিটা একজন যোদ্ধার। ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ, নিম্নাঙ্গে খালি হাঁটু অবধি একটা ধুতির মত কাপড় জড়ানো, হাতে উদ্যত অসি নিয়ে আক্রমণের ভূমিকায় যোদ্ধা পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। এই ভঙ্গিমায় তৈরি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অপূর্বদাকে জিজ্ঞেস করলাম—'মূর্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন খবর কাগজে পাননি?'

—'না, কারণ সে সম্বন্ধে কোন খবর বৃটিশ মিউজিয়ামের কর্তাদের কাছেও ছিল না, কার্বন ডেটিং করে তাঁরা শুধু জানতে পেরেছিলেন যে মূর্তিটা সমুদ্রগুপ্তের আমলের, ব্যাস ওইটুকুই! তুই বরঞ্চ আইগ্লাস দিয়ে খুঁটিয়ে দেখ, কিছু বুঝতে পারিস কিনা। এই নে আইগ্লাস।'

কিন্তু ড্রয়ার খুলে আইগ্লাস বের করতে গিয়ে হঠাৎই অপূর্বদার হাত ফস্কে মূর্তিটা মাটিতে সশব্দে পড়ে গিয়ে তিন টুকরো হয়ে গেল। অপূর্বদা চমকে উঠলেন 'এ কি! তামার মূর্তি এই ভাবে ভাঙল কেন? হাত

থেকে পড়লে তো তুবড়ে যাবার কথা।'

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দেখলাম ভাঙা মূর্তির পেটের ভেতর থেকে ছড়িয়ে পড়ল এক মুঠো রঙীন পাথর আর একটুকরো হলদেটে কাগজ।

অন্য কেউ হলে হয়ত পাথরগুলোই আগে তুলে নিয়ে দেখত, কিন্তু আগেই বলেছি অপূর্বদা চিরকালই অন্যরকমের। নিচু হয়ে কাগজের টুকরোটা খুলে নিয়ে সাবধানে ভাঁজ খুললেন। অপূর্বদার কাঁধের ওপর দিয়ে আমি ঝুঁকে দেখলাম কাগজটাতে কিসব প্রাচীন ভাষায় আঁকিবুঁকি কাটা রয়েছে। পাঁচ মিনিট ধরে লেখাটা পড়ার পর অপূর্বদা যখন মুখ তুললেন তখনো চিন্তায় তাঁর জ্র দুটো কুঁচকে আছে।

'এটাতে যা লেখা আছে তার বাঙলা করলে কি দাঁড়ায় জানিস? দাঁড়ায়—'এই সামান্য কয়েকটি রত্ন অপহরণের জন্যে দস্যু মহীপাল শ্রেষ্ঠী জয়চাঁদের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করে। সেই অপরাধে, আমি, তাদের কুলগুরু মহীপালকে তাম্রমূর্তিতে পরিণত করে তার কাছে এই রত্ন গচ্ছিত রাখছি। যদি কোনদিন, অন্য কোন জন্মে জয়চাঁদের পুত্র এই রত্ন পায় তবেই মহীপাল মুক্তি পাবে।'

নিজের অজান্তে চোখটা মেঝের দিকে চলে যেতেই মুখ দিয়ে একটা বিস্ময় সূচক শব্দ বেরিয়ে এল।

মেঝেতে তখনো রত্নগুলো ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু মূর্তিটার ভাঙা টুকরোগুলো অদৃশ্য!

অনড়হয়ে বসে রইলাম।

ঘরের একমাত্র দরজার খিলটা তখন আপনা আপনিই খুলে যাচ্ছে। □

আশ্চর্য এই দুনিয়া সূর্যের মুখ দেখেনি কোনোদিন। দুদিকে দুটি ছায়াপথ টানছে দুদিক থেকে—লক্ষ কোটি বছর ধরে। ঝুলছে ত্রিশঙ্কুর মত। কিন্তু একদিন তো ভারসাম্য নষ্ট হবেই। সেদিন ঘটবে প্রলয়ংকর কাণ্ড!

এখানকার শৈত্য কল্পনাতীত। তবুও আছে সমুদ্র—জলের নয়—আশ্চর্য এক মৌলিক পদার্থের—যা শূন্য তাপাংকের সামান্য ওপরেও তরল থাকতে পারে। এখানকার অগভীর হিলিয়াম সমুদ্রে তড়িৎ শক্তি প্রবাহিত একই ভাবে আবহমান কাল ধরে।

যন্ত্রমস্তিষ্কের স্বর্গ এই দুনিয়া। প্রাণের শত্রু। যান্ত্রিক ধীশক্তির লীলা নিকেতন—প্রাণশক্তির নয়। কঠিন স্ফটিক আর আণুবীক্ষণিক ধাতব স্তরের আবরণে সুরক্ষিত আলয়ে নিবাস এই যান্ত্রিক ধীশক্তির।

নিঃসঙ্গ গ্রহ। নিশ্চুপ ধীশক্তির কিন্তু একদিন টনক নড়ল। তথ্যের ভাঁড়ার যে অসম্পূর্ণ। অনেক কিছুর এখনো জানার বাকী! দুই ছায়াপথের টাগ-অফ-ওয়ারের টানাটানিতে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসার আগেই বাইরের দুনিয়ার ঐ অসংখ্য তারার জগতে কোথাও ঠাঁই পাওয়া যায় কিনা দেখা দরকার বৈকি!

বিস্তৃত হল চিন্তাশক্তি। অসংখ্য স্ফটিকের জাফরি দিয়ে নতুন করে গড়ে নিলে নিজেদের। ধাতব পরমাণুর স্রোত বয়ে গেল আশ্চর্য গ্রহের ওপর দিয়ে। একই রকম দুটি জাতক-মস্তিষ্ক মুকুলিত হল হিলিয়াম সমুদ্রের তলদেশে—বৃদ্ধি পেতে লাগল নিয়মিত ছন্দে।

মনস্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হল ধীশক্তি অতিশয় দ্রুতবেগে। কাজ সম্পূর্ণ হল কয়েক হাজার বছরে। নিঃশব্দে, নিস্তরঙ্গ হিলিয়াম সমুদ্রে এতটুকু ঢেউ না তুলে নতুন সত্তাদুটি ধেয়ে গেল দূরের তারাদের জগতে। গেল দুই দিকে। দুই ছায়াপথের দিকে। দশলক্ষ বছর তাদের কোনো খবর এসে পৌঁছোলো না জন্মভূমিতে।

তারপরেই এল খবর—প্রায় একই সঙ্গে। ব্যর্থ হয়েছে দুটি অভিযানই। কয়েক পরার্ধ সূর্যের সম্মিলিত উত্তাপে মৃত্যু ঘটেছে দুই অভিযাত্রী সত্তার। সার্কিট গলে গেছে। অতিপরিবাহী শক্তি বিনষ্ট হয়েছে। ধীশক্তিময় দুটি খোসা কেবল ভেসে গেছে তারকাপুঞ্জের দিকে।

মৃত্যুর আগে কিন্তু আলোকের গতিবেগে চিন্তাশক্তির তরঙ্গ প'ঠিয়েছিল। জানিয়েছিল অসুবিধের ফিরিস্তি। বিস্মিত, হতাশ হয়নি জনক গ্রহ। শুরু করেছিল দ্বিতীয় অভিযানের প্রস্তুতি।...কয়েক কোটি বছর বাদে বাদে করেছে তৃতীয়টির...চতুর্থটির...পঞ্চমটির...!

এল সাফল্য—ধৈর্যের ফসল! কয়েক শতাব্দী ধরে মহাকাশের দু-দিক থেকে অবিরত ভেসে এল স্পন্দনের আকারে সংবাদ-প্রবাহ। নিরুদ্দেশ দুই অভিযাত্রীর অনুরূপ দুটি স্মৃতিভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে চলল সেই বিচিত্র সমাচার-সংগ্রহ!

প্রথম খবরটা বিস্ময়কর। দু-দিকের দুই ছায়াপথের একটির হাজার হাজার গ্রহে তল্লাসি চালিয়ে ধীশক্তির সন্ধান পাওয়া যায়নি!

অপর দিকের ছায়াপথে থিক্ থিক্ করছে বুদ্ধিমত্তা। প্রচণ্ড ধীশক্তি। অগণিত ইলেকট্রনিক সংকেতের জালে জড়িয়ে তাদের চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হচ্ছে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে। সংকেতগুলো বিশ্লেষণ করে অর্থ অনুধাবন করতে সন্ধানী অভিযাত্রীটির লাগল কয়েকটা শতাব্দী। আশ্চর্য এই ধীশক্তির কারও নিবাস নিদারুণ উষ্ণতায়—বরফও গলে যায় সেখানে। অদ্ভুত এই ধীশক্তির স্বরূপ নির্ণয় করতে গেল আরো কয়েক হাজার বছর। মানসিক আঘাতটা কিন্তু সইতে পারল না। সর্বশক্তি সংহত করে শেষ খবরটা নিক্ষেপ করে আত্মাহুতি দিল ক্রমবর্ধমান উত্তাপে।

সমস্ত স্মৃতি আর অভিজ্ঞতা কিন্তু সঞ্চিত রইল তার যমজের মধ্যে—জন্ম ভূমিতে। পাঁচ লক্ষ বছর পর শুরু হল জেরা। হ্যাঁ, ধীশক্তির সন্ধান সে পেয়েছে। নিশ্চিত হয়েছে ২৩৭ টা ক্ষেত্রে। সম্ভাবনা আছে ৩২টা ক্ষেত্রে। সেই সঙ্গে হাজির করল তিনের পিঠে ২৪টা শূন্য জুড়লে যা হয়— ততগুলো তথ্য। সেগুলোকে জোড়াতালা দিয়ে খাড়া করতেই গেল কয়েক হাজার বছর। পরিশেষে হতভম্ব হল জনক গ্রহ!

বিহ্বলতার কারণ আছে বৈকি! আশ্চর্য এই ধীশক্তির উৎস তো ধরা যাচ্ছে না!

৫০০ বছর লাগল তথ্যগুলোকে যাচাই করতে। নিশ্চয় কোথাও ভুল আছে!

না, ভুল নেই। কিন্তু অভিযাত্রী কেন যোগাযোগ স্থাপন করেনি বিচিত্র রহস্যময় এই ধীশক্তির সঙ্গে?—জবাবে উপস্থাপিত হল আরো সংবাদ— একের পিঠে ২৪টা শূন্য জুড়লে যা দাঁড়ায়—সংখ্যায় সেই রকম অনেকগুলো। বিচার বিশ্লেষণ করতে গেল আরও ৫০০ বছর। এবার ভয় পেল জনক গ্রহ।

সব খবরই নির্ভুল। ফলে, যে সিদ্ধান্তগুলো দাঁড়াচ্ছে, তা বিস্ময়কর এবং অবিশ্বাস্য হলেও মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

সিদ্ধান্ত ১ ॥ অজ্ঞাত এই ধীশক্তি সংখ্যালঘু।

সিদ্ধান্ত ২ ॥ এদের অধিকাংশই জলীয় পদার্থে গঠিত। স্বল্পায়ু। চেহারা অনমনীয় নয়। কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ফসফরাস এবং অন্যান্য পরমাণু থেকে নিতান্তই আনাড়িভাবে সৃষ্ট।

সিদ্ধান্ত ৩ ॥ অবিশ্বাস্য উচ্চ তাপমাত্রায় কর্মপটু, কিন্তু তথ্য বিশ্লেষণে শ্লথ-গতি।

সিদ্ধান্ত ৪ ॥ নিজেদের নতুন করে সৃষ্টি করার পন্থা এতই জটিল এবং অনিশ্চিত যে সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় নি।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা অতীব মারাত্মক। বিচিত্র রহস্যাবৃত এই ধীশক্তি নাকি আশ্চর্য দুনিয়ার অনুরূপ যান্ত্রিক ধীশক্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম—অন্তত: তাদের দাবী তাই!

এক হাজার বছর গেল সব ক'টা সিদ্ধান্ত মিলিয়ে মিশিয়ে সংগৃহীত তথ্যপ্রাণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করতে।

সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত দাঁড়াল একটাই: অযান্ত্রিক এই ধীশক্তির অস্তিত্বই নেই—নিছক কল্পনামাত্রর। মৃত্যুপথের যাত্রী অভিযাত্রী যন্ত্রাংশের ত্রুটিই এ

জন্যে সম্ভবতঃ দায়ী।

কিন্তু ধোঁকা লাগল এক জায়গায়। যান্ত্রিক ধীশক্তির স্রষ্টাও তাহলে নিশ্চয় কোথাও আছে···সেই স্রষ্টারও স্রষ্টা আছে···কোথাও না কোথাও! এই যুক্তি থেকেই আসা গেল আরও একটা সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে। অযান্ত্রিক ধীশক্তির স্রষ্টাও তারা!

সর্বশেষ এই সিদ্ধান্তটা অসম্ভব। তবুও তদন্ত সাপেক্ষ। অসম্ভব যদি সত্যি হয়, তাহলে তার প্রতিকার করতে হবে।

এবং সে প্রতিকার হবে······!

আজ থেকে দশ লক্ষ বছর আগে চরম প্রতিকারের যে সংকল্প গ্রহণ করেছিল যান্ত্রিক ধীশক্তি, তার রূপায়ন চলছে আজও। বিগত পঞ্চাশ বছরে সহসা সমুজ্জ্বল নক্ষত্রগুলোর এক চতুর্থাংশ দেখা গেছে আকাশের একটা ছোট্ট কোণে! অ্যাকুইলা নক্ষত্রমালা!

২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর কাছাকাছি পৌঁছোবে সংহারসংকল্পদৃঢ় নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রলয় অভিযান!!* □

*আর্থার সি ক্লার্ক রচিত 'ক্রুসেড' অবলম্বনে।

৬৪০
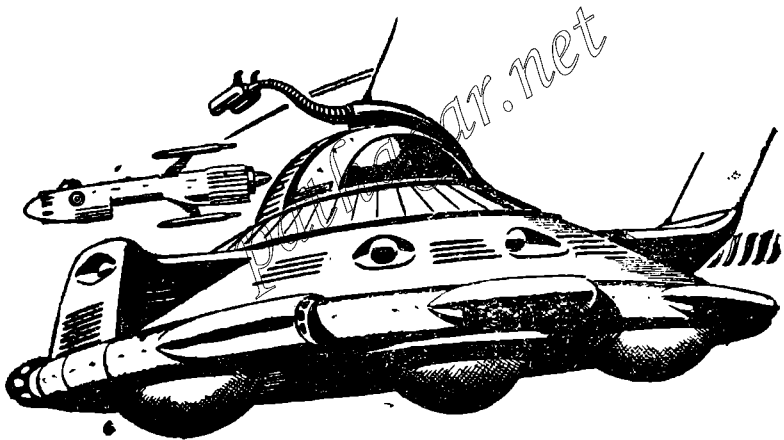
অদৃশ্য সেই ভয়াল দাঁত

১০ই মে ১৯৫১ সাল। ম্যানিলায় এখন রাতের বেলায় বেশ গরম। এক নতুন বিস্ময়কর নাটকের যবনিকা উঠল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। এক মৃগীরোগাক্রান্ত মেয়েকে ঘিরে জমে উঠেছে বিস্ময়! চীফ মেডিকেল অফিসার এলেন রাতের বেলায়। রেগে আগুন হলেন পরীক্ষা করার পর…এক মৃগীরুগীর জন্যে রাতের বেলা ঘুম থেকে তুলে আনা! ম্যানিলার মেয়র কিন্তু নির্বাক…এক ভাবে চেয়েছিলেন মেয়েটির দিকে…ডান হাতের উপর পর পর কয়েকটা রক্তলাল বিন্দু…দাঁতের দাগ। অজ্ঞান অবস্থায় নিজেই কামড়েছে নাকি? নয়তো মানতে হয় মেয়েটির আজব গল্পটিকে…পুলিশের সেলের মধ্যে ধারালো দাঁত বসিয়ে দংশন করেছে অদৃশ্য এক দানবীয়-শক্তি! অবিশ্বাস্য…উদ্ভট…হাস্যকর!

না…আবার সেই রাতের বেলায় সেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল থানার বড়বাবু। ভয়ার্ত চীৎকার করে মিনতি জানাল মেয়েটি…আবার দাঁত বসাচ্ছে সেই নরকের শয়তান…পুলিশ কিন্তু ফিরেও তাকাল না নতুন দংশনজনিত আট-আটটা দাগের দিকে। আবার ভয়ংকর আর্তনাদ করে উঠল সে…লোহার মোটা দরজা ভেদ করে আবার…আবার এসেছে সেই দানব…উঃ, ধারালো দাঁত বসাচ্ছে শরীরের মধ্যে…এবার আর চুপ করে থাকতে পারল না পুলিশ…দরজা খুলে বাইরে বার করে নিয়ে এল ভয়ার্ত মেয়েটিকে…সকলের চোখের সামনে উজ্জ্বল আলোর মধ্যে মেয়েটি হাত আর কাঁধের উপর ফুটে উঠতে লাগলো পরপর রক্তমুখী বিন্দু…ধারালো দাঁতের দাগ…প্রতিটা দাঁতের দাগের চারপাশে হড়হড়ে লালার চিহ্ন!

আবার ছুটে এল সকলে…এলেন মেয়র, পুলিশ প্রধান আর চীফ মেডিকেল অফিসার। মেয়েটির নিজের দাঁতের দাগ নয় তো? হাতের উপর নিজেই নিজের দাঁত বসাতে পারে মেয়েটি…কিন্তু নিজের কাঁধে বা ঘাড়ে দাঁত বসানো অসম্ভব তার পক্ষে! এতো বড় অদ্ভুত ব্যাপার!

ক্ল্যারিটা ভিলান্যুভা বাকী রাতটা কাটালো পুলিশ অফিসারের সামনে

বেঞ্চির উপর···কাঁদতে কাঁদতে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পরের দিন কোর্টে হাজির করল পুলিশ ভিলান্ন্যভাকে···অভিযোগ—ভবঘুরেপনা ভিক্ষাবৃত্তি। কোর্টের মধ্যে আর্তনাদ করে উঠল ক্ল্যারিটা—আবার···আবার আসছে দানবটা···দু'জন তাগড়াই পুলিশ চেপে ধরল তার দুটো হাত দুদিক থেকে···কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছে মেয়েটা···কোর্টের মধ্যে পুলিশ, ডাক্তার, রিপোর্টারের সামনে গভীর ক্ষত চিহ্ন ফুটে উঠতে শুরু করল ক্ল্যারিটার হাতের পাতায়, হাতের উপরে আর ফর্সা ঘাড়ের মধ্যে। পুরো পাঁচ মিনিট ধরে চললো সেই অদৃশ্য নারকীয় জীবের দংশন হতভাগ্য মেয়েটার উপর।

ডাক্তারী পরীক্ষক মেরিয়ানা লারা পরীক্ষা করলেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে। বললেন, না···মোটেই মৃগী-রোগাক্রান্ত নয় মেয়েটি। অলীক কল্পনা নয় রক্তাক্ত দাঁতের দাগগুলো। তাছাড়া, মেয়েটির নিজের দাঁতের দাগও না ওগুলো। আর্চ বিশপকে ডাকা হল তৎক্ষণাৎ। মেয়রও এসে পড়লেন আধ ঘণ্টার মধ্যে। ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরে এসেছে ক্ল্যারিটার। ধারালো দাঁতের দংশনের দাগগুলো ফুলে উঠেছে লাল হয়ে···যন্ত্রণায় কাতর সে··· কোর্ট থেকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হল ক্ল্যারিটাকে···সঙ্গে এলেন মেয়র, ডাক্তার এবং আরো অনেকে। হাসপাতালের মধ্যে আবার আর্তনাদ করে উঠল সে···আবার তেড়ে আসছে দানবটা···সকলের দৃষ্টিতে অদৃশ্য হলেও ক্ল্যারিটার কাছে ভয়ংকর বাস্তব···এবার সঙ্গে এসেছে আর এক কুৎসিৎ শয়তান···ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো নারকীয় উল্লাসে উন্মত্ত···মেয়র ল্যাকসনের সামনেই ধারালো দাঁত বসতে শুরু করল মেয়েটির দেহের নরম মাংসের মধ্যে। এবার আরো গভীর হল দংশনগুলো···রক্তাক্ত হয়ে গেল সর্বাঙ্গ···মেয়র ধরে থাকা সত্ত্বেও পাঁচ পাঁচটা অদৃশ্য দাঁত বসে গেল ক্যারিটার মসৃণ ঘাড়ের উপর। ভয়ঙ্কর আতঙ্কে শিউরে উঠলেন মেয়র, চীফ মেডিকেল অফিসার আর হাসপাতালের কর্মীবৃন্দ। সেই শেষ দংশন··· বাকী জীবন নিরুপদ্রবে কেটে ছিল ভিলান্ন্যভার। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান আমরা কি অসহায় বোধ করছি না অবিশ্বাস্য এই ঘটনা শোনবার পর? ঘটনাটা কিন্তু সত্য!

ইন্দ্রলীন ঘোষ